

সভ্যতার আদিপর্বের আবিষ্কার ও তৎপরতা

সুধাংশু পাত্র



সভ্যতার আদিপর্বের আবিষ্কার ও তৎপরতা

সুধাংশু পাত্র

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৯৬
এপ্রিল, ১৯৮৯

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
দুলালচন্দ্র ঘোষ
নিউ লোকনাথ প্রেস
৮এ, কাশীবোস লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম : ১৬ টাকা
Rupees Sixteen Only

বিজ্ঞানের প্রথম পাঠকদের

সূচীপত্র

কৃষিকাজ

তোমরা নিশ্চয়ই জানো, খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। আর ঐ খাদ্যের অধিকাংশই আসে কৃষি থেকে। শুধু কী খাদ্য? আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলির একটা বড় অংশকে সংগ্রহ করতে হয় কৃষির মাধ্যমে। তাই বলা যেতে পারে, কৃষি ছাড়া মানবসভ্যতা একেবারেই অচল।

তোমাদের এবার নিশ্চয়ই মনে আসবে, কৃষির মত এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা মানুষের মাথায় প্রথম কেমন করে ঠাঁই পেয়েছিল? প্রথম কে বা কারা শুরু করেছিল চাষ? কোথায় পেয়েছিল তারা বীজ এবং কেমন করেই বা শক্ত মাটির বুকে আঁচড় কেটেছিল?

সে এক মস্ত বড় ইতিহাস। সে ইতিহাস কেউ লিখে যায়নি, কারও মুখ থেকে সংগ্রহ করে পরের দিকে লিপিবদ্ধও করে যায়নি কেউ। শুধু অতীতের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত কৃষি যন্ত্রপাতি এবং সেকালের মানুষের আঁকা কিছু কিছু ছবি থেকে পণ্ডিতেরা কতকগুলো কাহিনী যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন মাত্র। বড় বিচিত্র, বড় রোমাঞ্চকর সেই সব কাহিনী।

প্রথমেই বলতে হয় যে, পৃথিবীতে মানুষ এসেছে লক্ষ লক্ষ বছর আগে। কিন্তু কৃষির ইতিহাস মাত্র হাজার দশেক বছরের আগে নয়। তাই বলে মানুষ যে একেবারে হুট করে চাষবাসের ব্যাপারটা আয়ত্ত করে নিয়েছে—এমনও নয়। এর পেছনে আছে কত সুদীর্ঘকালের প্রচেষ্টা এবং কতজনের কত অধ্যবসায়।

তাহলে শোন সেই অতীতের আলো-আঁধারি কাহিনীগুলো তথা আমাদের পূর্বপুরুষদের তৎপরতার কথা।

পণ্ডিতদের মতে আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর আগে

পৃথিবীর বুকে হঠাৎ সূচিত হয়েছিল ভয়ঙ্কর এক শীতল পরিবেশের। সেদিন যে সব মানুষ বৃক্ষশাখা অবলম্বন করে কাল কাটাতো যারা যাযাবরের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াতো তারা সবাই বাধ্য হয়েছিল গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করতে।

সেদিনের সেই গুহাবাসী মানবরা আবার আজকের মত ছিল না। না চেহারায়, না আদব কায়দায়। তবে সেই প্রচণ্ড শীতেও খাদ্যসংগ্রহ অবশ্যই করতে হতো তাদের এবং যে খাদ্য ছিল বন থেকে সংগ্রহ করা ফলমূল, নয়ত পশুপাখী। আর সে কী বীভৎস ও কষ্টের দিন ছিল তাদের। গায়ে কোন পোষাক ছিল না, আগুন জ্বালাতে জানতো না, মুখে ভাষাও তখন আসেনি। একরকম আদুড় গায়ে, অথবা সামান্য একটুকরো পশুর চামড়াকে গায়ে জড়িয়ে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতো বনে বনে এবং বসুমতী প্রসন্না হয়ে যতটুকু তাদের হাতে তুলে দিতেন কেবল ততটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতো তারা।

বনে বনে ঘুরে বেড়ানোটাও সহজ ছিল না। হিংস্র জন্তুরা গিস্‌গিস্ করতো। সেই বিরাট বিরাট দাঁতওয়ালা বাঘ, সেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিংওয়ালা বাইসন, সেই ঝাঁকড়া চুলওয়ালা অতিকায় হাতি বা ম্যামথ—যেন রূপকথার সেই ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দৈত্য-দানোরা। শুধু কী তাই! নদীতে নদীতে এবং বড় বড় জলা জায়গায় ঘুরে বেড়াতো অজস্র কুমীর, ডাঙায় এখানে ওখানে পড়ে থাকতো বিরাট বিরাট অজগর এবং গাছে গাছে লুকিয়ে থাকতো কত বিষাক্ত কীটপতঙ্গ। সব বাধাকে তুচ্ছ করে কেবল খাদ্যের জন্যই মানুষকে সাহসে ভর করে এবং গায়ের জোরে এগিয়ে যেতে হতো।

গুহাবাসী হওয়ায় মানুষের একটা বড় লাভ হয়েছিল। অর্থাৎ দলবদ্ধ হয়ে বাস করার সুবিধাগুলি অনুভব করতে পেরেছিল এবং সেই থেকেই গড়ে তুলেছিল এক একটি সমাজ। এক একটি দলে বাস করতো শত শত নারী ও পুরুষ। পুরুষেরা দূর বনে পশুশিকারে বেরিয়ে যেতো আর মেয়েরা কাছাকাছি অঞ্চলে ফলমূল সংগ্রহ করতো এবং জলা থেকে তুলতো শাক-পাতা ও শামুক-গুগলী। মেয়ে হলে

কী হবে তাদের গায়েও ছিল অসুরের শক্তি এবং বুকে পৃথিবী জয় করার সাহস। বাইসনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারতো, তর তর করে গাছে উঠতেও ছিল ওস্তাদ এবং কুমীরের সঙ্গে লড়াই করে জলাগুলো-কে চষে ফেলতেও দ্বিধা করতো না। আর পাশাপাশি অঞ্চলগুলো তাদেরই ছিল নখদর্পণে।

পণ্ডিতদের বিশ্বাস, সেদিনের সেই অতি ভয়ঙ্করী ও সাহসী মেয়েরাই প্রথম গুহার চারপাশে শস্যবীজ ছড়িয়ে চাষের সূচনা করে-ছিল। অর্থাৎ আদিকালের আদি মায়েরাই বুদ্ধি বলে এবং গায়ের জোরে বিশ্বপ্রকৃতির কাছ থেকে জেনে নিয়েছিল চাষের উপায়। লালন-পালনের মাধ্যমে মা যেমন সন্তানকে পৃথিবীতে বাঁচার অধিকার দিয়ে থাকেন, তেমনই সেই আদিকালের আদি মায়েদের যত্নে ও প্রচেষ্টায় কৃষিব্যবস্থার পত্তন হয়েছে। আর পৃথিবীর সর্বকালের সমস্ত মায়ের সন্তানদের বেঁচে থাকার উপায় বাৎলে দিয়ে গেছে তারাই।

সেদিনের সেই মায়েদের কথা আরও একটু বলতে হয়। প্রকৃতিতে তারা যেমন ভয়ঙ্করী ছিল, তেমনই ভয়ঙ্কর ছিল তাদের সন্তানবাৎসল্য। সেই অতি ভয়ঙ্কর বন্যপরিবেশে একমাত্র মাতৃস্নেহের ভয়ঙ্কর শক্তিই টিকিয়ে রেখেছিল মানবজাতিকে। যেই হাতে বন্য বাইসনকে ঠেকাতে পারতো, যেই হাতে এক একটি অজগরের মুখকে চিরে দুফাঁক করে দিতো, সেই হাতেই কুসুম-পেলব শিশুর মুখে তুলে দিত বুকের অমৃতধারা। শুধু কী তাই! তাদের বুকের পীযূষ কেবলমাত্র আপন সন্তানের জন্য নির্দিষ্ট থাকতোনা, মাতৃহারা যে-কোন শিশুর মুখে অম্লানবদনে ঝরিয়ে দিতো। পরমাপ্রকৃতি মহামায়ার মতই সমস্ত আসুরিক শক্তিকে পদদলিত করে আপন বংশধারাকে যেমন অব্যাহত রেখে গেছে তেমনই-কৃষির মাধ্যমে অন্নসংস্থানেরও ব্যবস্থা করে গেছে। মাতৃদুগ্ধের যেমন বিকল্প নেই, তেমনই কৃষির বিকল্প আজও আবিষ্কৃত হয়নি।

এখন আরও একটা প্রশ্ন আসবে তোমাদের মনে। আদি-

মায়েরা কোথায় পেয়েছিল বীজ এবং কেমন করেই বা শিখেছিল চাষ করতে!

এই ব্যাপারটির মূলে আছে তাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি। পণ্ডিতদের মতে সেকালে একেবারে প্রাকৃতিক নিয়মেই পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন তৃণের আবির্ভাব হতো। মেয়েরা যেহেতু জলার ধারে ধারে এবং উপত্যকাগুলিতে ঘুরে বেড়াতো, তাই তাদের সবসময় চোখে পড়তো নানাজাতের তৃণ। তারা আরও লক্ষ্য করেছিল, বিশেষ বিশেষ ঋতুতে এমন কিছু কিছু তৃণ জন্মায়—যাদের একসময় ডগায় দেখা যায় শীষ। সেই শীষ পেকে উঠতো এবং পেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাছও মরে যেতো।

আহার্য-সংগ্রহ করতে গিয়ে মেয়েরাই পরখ করেছিল সেইসব তৃণের বীজকে। তারা খোসা ছাড়িয়েছিল, চিবিয়ে খেয়েও ছিল। ভাল লাগার জন্য এবং পেট ভরানোর জন্য যেখানে যত পেতো এই ধরনের বীজ, সবই বয়ে আনতো বাসায়। তারপর সবাই মিলে পর-মানন্দে ভোজন করতো।

খেয়ালি প্রকৃতির বুকে বছরের সব সময় সমভাবে এইসব তৃণ জন্মাতো না। অপরদিকে পেট ভরাবার এই সহজতর উপকরণটিকে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল। যেহেতু বছরের পর বছর ঘোরাফেরার ফলে তারা বুঝতে পেরেছিল বর্ষার প্রারম্ভেই এইসব তৃণ জন্মায় এবং বর্ষাকাল গত হয়ে গেলে শীষ আসে এবং শীষে পাক ধরে। তাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় অধিক শস্য লাভ করতে যথাসময়ে উপযুক্ত জায়গায় বীজ ছড়াবার ব্যবস্থা করতে যত্নবান হয়েছিল।

আজকের গবেষকরাও দেখেছেন, আজকের দিনে যাদের আমরা গম ও বার্লি বলি, তাদের পূর্বপুরুষ হচ্ছে "ডিনকেল" এবং "এমের" নামের দু-জাতের বুনো ঘাস। বিশেষ বিশেষ পাহাড়ী এলাকায় এখনও ওদের প্রচুর পরিমাণে আপনা হতে জন্মাতে দেখা যায়। ডিনকেলকে দেখা যায় বলকান, ককেসাস ও এশিয়া মাইনরে এবং এমেরকে দেখা

যায় প্যালেস্টাইন ও পারস্যে। উক্ত কারণে পণ্ডিতদের অনুমান, বীজ প্রকৃতির ভাণ্ডারেই ছিল। শুধু খাদ্য হিসাবে ওদের গ্রহণ করা যায়—এই সত্যটি আবিষ্কার করেছিল মেয়েরা এবং চাষ করার মনোভাবও প্রথম ঠাঁই পেয়েছিল ওদেরই মাথায়।

এবার প্রশ্ন উঠবে, কোথায় এবং কতকাল আগে চাষের প্রচলন হয়েছিল! এবিষয়ে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। একদল গবেষকের মতে আজ থেকে প্রায় হাজার সাতেক বছর আগে মিশরের নীলনদ অঞ্চলেই শুরু হয়েছিল প্রথম চাষবাস। আর একদল মনে করেন, চাষবাসের ব্যাপক প্রচলন ঐ সময় থেকে শুরু হলেও উক্ত বিদ্যাটি কোন কোন দল আয়ত্ত করেছিল গুহাবাসের শেষের দিকে—যখন পৃথিবীর বুক থেকে শীতল পরিবেশটা অপসারিত হয়ে যায়। একেবারে নব্যপ্রস্তরযুগের প্রারম্ভে। সময়কাল—আজ থেকে অন্ততঃ দশ হাজার বছর আগে। সে সময়টাতে মানুষ কেবল-মাত্র কৃষির উপর নির্ভর করতো না, ফলমূল সংগ্রহ ও পশুশিকার ছিল তাদের মুখ্য উপজীবিকা। শুধু আশেপাশের উপত্যকাগুলিতে বীজ বুনে যতটুকু ফসল পেতো, তা উপরি পাওনা হিসাবে গ্রহণ করতো।

মানুষ ফসলের গুরুত্ব অনুভব করেছে আরও পরে। আর যখনই অনুভব করেছিল তখনই আরম্ভ করেছিল যাযাবরের জীবন। বার-বার একই ফসল উপত্যকাগুলিতে চাষ করা হতো বলে কয়েক বছর পরে সেখানে আর ভাল ফসল ফলতো না। এবং আশেপাশে শিকারযোগ্য পশুরও ঘাটতি ঘটতো। ফলে উপযুক্ত জায়গা অনু-সন্ধানের জন্য ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তবে তাদের এই অনুসন্ধান মধ্যপ্রাচ্যের কিছু কিছু অঞ্চলের মধ্যে ছিল সীমাবদ্ধ।

উক্ত মতবাদের স্বপক্ষে বিজ্ঞানীরা কতকগুলো প্রমাণও পেয়েছেন। তাঁরা খননকার্যের ফলে প্যালেস্টাইনের ওয়াদি এল নাটুফ, মেসো-পটেমিয়ার টেলহামুনা, পারস্যের টেপ-শিয়ালক, মিশরের ফায়কু হ্রদের তীরভূমি, বালুচিস্তানের রাণা ঘুণ্টাই-টেল প্রভৃতি জায়গায়

লাভ করেছেন পাথরের তৈরি কাস্তে, নিড়ানী, শস্যবীজ ছাড়াবার ও গুঁড়া করার খল এবং শস্যকে জমা করে রাখার বড় বড় মৃৎপাত্র। এগুলো সবই নব্যপ্রস্তর যুগের তৎপরতা। আরও কতকগুলো পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, প্যালেস্টাইনের ওয়াদি এল নাটুক এলাকায় প্রাপ্ত কৃষির উপযোগী সরঞ্জামগুলিই সর্বাধিক পুরাতন। তাই অধিকাংশ গবেষকের বিশ্বাস, প্রথম ঐ প্যালেস্টাইনের অধিবাসীরাই সুপরিকল্পিতভাবে ফসল ফলাবার উপায় উদ্ভাবন করেছিল।

নব্যপ্রস্তর যুগের শেষে তথা তাম্রযুগের প্রারম্ভে সবরকমের যন্ত্রপাতির উন্নতি হয়েছিল এবং নদীতীরে বসবাসের সুবিধাগুলি উপলব্ধি করেছিল। কেন না নদীতীরে হিংস্রজন্তুদের ভিড় ছিল না, নদীতে প্রচুর মাছ কাঁকড়া পাওয়া যেতো এবং নদীর তীরভূমি ছিল বেশ উর্বর। একমাত্র বন্যার ভয় ছাড়া অন্য কোন কিছুতে ভয় ততটা ছিল না। তাই তাম্রযুগের প্রারম্ভে পৃথিবীর পরিবেশ মনোরম হয়ে ওঠায় দলের পর দল এসে নদীর তীরগুলিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে দেয়। দেখতে দেখতে বড় বড় নদীর দুইতীরের বিস্তীর্ণ এলাকাগুলি ভরে যায় মানুষের আবাসে এবং গড়ে উঠে এক একটি কৃষিভিত্তিক সভ্যতা। মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস, মিশরের নীলনদ, ভারতের সিন্ধু ও গঙ্গা, চীনের ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহো, প্রভৃতি নদীর তীরে গড়ে ওঠা আদিম নগরসভ্যতাগুলি সবই ছিল কৃষিভিত্তিক।

প্রথমে মনে হয়, যারা চাষবাস করতে শিখেছিল তারা সবাই চাষ করতো গম ও বার্লির। পরের দিকে তারা প্রকৃতির ভাণ্ডারে আরও বহু শস্যের সন্ধান লাভ করে এবং ধীরে ধীরে ডাক দেয় ধান, মিলেট, যব, রাই প্রভৃতির। প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা ও সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষগুলি থেকে গম, যব ও রাই যথেষ্টই পাওয়া গেছে কিন্তু ধান পাওয়া যায়নি।

বিভিন্ন নমুনা থেকে বিজ্ঞানীরা স্থির করেছেন, ধানচাষ প্রথমে ভারতেই শুরু হয়েছিল। পরে খ্রীষ্টপূর্ব দু'হাজার অব্দের দিকে চীনেই

প্রথম ব্যাপকভাবে ধানচাষ শুরু হয়।

তবে মনে রাখতে হবে যে আদি থেকে নদীতীরে বসবাস স্থাপন পর্যন্ত মেয়েরাই চাষ করার কাজে মুখ্যভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পুরুষদের দিনের বেলায় বসে থাকার সুযোগ ছিল না। তারা মাছ ধরতো, শিকার করতো এবং খুঁজে খুঁজে পাহাড় থেকে পাথর বয়ে আনতো, আর রাতে অস্ত্রশস্ত্র বানাতো। অতএব ফসল বোনা, জল-সেচ করা এবং ফসল তোলা, সবই করতো মেয়েরাই। কোন কোন সময় পুরুষেরা তাদের সাহায্য করতো, এইমাত্র।



খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত প্রস্তর যুগের কৃষি যন্ত্রপাতি

প্রথম প্রথম চাষের জন্য ভূমিকর্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি মানুষ। আর এই সত্যটিও উপলব্ধি করতে তাদের লেগেছিল কম করে হাজার বছর। সে সময় ধাতুর ব্যবহার না জানায় পাথরের ফলক দিয়ে মাটিকে আঁচড়াতো তারা। কিন্তু এভাবে মাটি আঁচড়াতে গিয়ে পর্যাপ্ত ফসল বোনার সুযোগ পেতো না। কম সময়ে ও অল্পায়াসে ভূমিকর্ষণ করতে গিয়ে তারা একদিন লাঙ্গলের পরিকল্পনা করেছিল। তাও সেই প্রস্তরযুগেই।

সেদিনের সেই লাঙ্গলও আজকের মত ছিল না। একটা মাত্র

বাঁকানো গাছের ডালকে খুঁজে খুঁজে পছন্দ করতো। তলায় জুড়ে দিতো পাথরের ফলক এবং মাঝখানে জুড়ে দিতো একটা কাঠের দণ্ড বা ঈষ। সেই লাঙ্গলকে আবার মানুষই টানতো এবং একজন জোর করে মাটির সঙ্গে চেপে ধরতো। অবশ্য প্রতিবছর নদীতে বন্যা আসার দরুণ নদীতীরে পলিমাটির স্তর পড়তো। তাই মাটি কর্ষণে বিশেষ বেগ পেতে হতো না।

তাম্রযুগে যন্ত্রপাতির উন্নতি হওয়ায় এবং মানুষ গৃহপালিত পশুদের ভূমিকর্ষণের কাজে নিয়োগ করায় লাঙ্গলের উন্নতি হয়েছে। তাও এক-আধ বছরে হয়নি। নিড়ানি, কোদাল ইত্যাদিরও উন্নতি হয়েছে ঐ সময় থেকে।

পশুপালন

মানবসভ্যতার দ্রুত উন্নতির মূলে পশুসমাজের দান মনে হয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। একে তো কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত মানুষ প্রধান খাদ্যহিসাবে গ্রহণ করতো পশুমাংসকে, তার উপর যখনই শুরু করলো কৃষিকাজ তখনই ডাক দিয়েছিল সেই অরণ্যের পশুকে। শুধু কৃষিকর্মে নয় অরণ্য থেকে কাঠ ও পাহাড় থেকে পাথর বয়ে আনতে, পথশ্রমকে লাঘব করতে, অল্পায়াসে শিকার ধরতে, মালপত্র বহন করতে, প্রায় সব কাজেই নিয়োগ করেছিল পশুকে। এককথায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল পশুশক্তির উপর এবং সেই নির্ভরশীলতা বর্তমান যন্ত্রযুগেও পুরোপুরি আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। অতএব আদিতে পশুশক্তির সন্ধানলাভও মানুষের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলির অন্যতম।

মানুষ এককালে অবশ্য পশুদেরই সমপর্যায়ভুক্ত ছিল। যেদিন সে মাটির উপর মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখেছিল সেইদিন থেকেই তার মস্তিষ্কের দ্রুত উন্নতি হতে শুরু করেছিল এবং সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে পড়েছিল পারিপার্শ্বিক সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের কাছ থেকে। আর ঐ উন্নত মস্তিষ্কের জন্যই অগণিত অতিকায় জীবজন্তুদের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল—অপরাপর বহুজীবের মত তাকে হারিয়ে যেতে হয়নি।

দীর্ঘকাল পশুদের সঙ্গে একত্রে বসবাসের ফলে মানুষ কিছু কিছু পশুর স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগও পেয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল, অধিকাংশ তৃণভোজীই অত্যন্ত নিরীহ। এদের মাংসও তারা খেতো। তাই হয়ত প্রথম প্রথম মাংসের লোভেই প্রতিপালন করতো মেষ, ছাগল প্রভৃতিকে। যার জন্য নব্যপ্রস্তর যুগের মধ্যভাগে মানুষ পশুচারণের জন্যই গ্রহণ করেছিল যাযাবর-বৃত্তি। তবে এও সত্য যে, মানুষ সর্বপ্রথম শিকারের সুবিধার জন্য

কুকুরকেই পোষ মানিয়েছিল। অনেকের মতে মধ্যপ্রস্তর যুগেও সব দলের মানুষের সঙ্গী ছিল কুকুর। তারপর নব্যপ্রস্তর যুগে মেষ ও ছাগলকে, কৃষিকাজ আরম্ভ করার সময় গরু ও মহিষকে এবং সর্বশেষে পোষ মানিয়েছিল ঘোড়া, হাতী, উট প্রভৃতিকে।

মানুষ ঐ গবাদি পশুদের কেমন করে যে পোষ মানিয়েছিল সে বিষয়ে নানা জনে নানা মত পোষণ করে থাকেন। প্রথম মত অনুযায়ী মানুষ যে সময়টাতে কৃষিকাজ শুরু করেছিল, সেই সময়ে বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করতো। যেমন কেউ শুধু শিকার নিয়ে ব্যস্ত থাকতো, কেউ পশুপালন করতো, আবার কেউ বা কৃষিকাজ করতো। আর সর্বক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতের পশুই ছিল তাদের সহায় এবং পশুদের কাজে লাগাতে শিখেছিল নব্যপ্রস্তর যুগের প্রারম্ভেই।

দ্বিতীয় আর এক মতের সমর্থকরা মনে করেন, মানুষ একই সঙ্গে চাষবাস এবং পশুপালনের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিল। উক্ত মতবাদের পেছনে যুক্তি হচ্ছে, যেসব জায়গায় প্রাকৃতিক নিয়মে ডিনকেল, এমের প্রভৃতি বুনোঘাসের আমদানি হয়েছিল, সেইসব জায়গায় যেন প্রকৃতির খেয়ালেই আবির্ভূত হয়েছিল গবাদি পশুরা। সেকালের পিরেনীজ পর্বতমালা থেকে হিমালয় পর্যন্ত যে বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে ঘুরে বেড়াতো গরু, মহিষ, শূকর, মেষ ও ছাগল। এখনও সে সব জায়গায় তাদের কাউকে কাউকে দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে তুরস্ক ও পারস্যের পার্বত্য অঞ্চলে আজও ঘুরে বেড়ায় মুফ্রন নামে একটি প্রজাতির বুনো মেষ এবং আফগানিস্তান পাঞ্জাব ও তুর্কীস্তানে দেখতে পাওয়া যায় য়ুরিয়াল নামের আর একটি প্রজাতির মেষকে।

তৃতীয় আর একটি মতের সমর্থকরা মনে করেন, আজ থেকে আট কিংবা দশ হাজার বছর পর্যন্তও পৃথিবীর আবহাওয়ার ঘন ঘন পরিবর্তন আসতো। পৃথিবীতে যে তুষারযুগ হানা দিয়েছিল সেইটি উক্ত সময়ে অপসারিত হয়ে যায়। ফলে শীতল পরিবেশের পরিবর্তে সূচিত হয়

উষ্ণ পরিবেশের। একদিকে যেমন বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচণ্ডভাবে বরফ গলতে শুরু করে অপরদিকে তেমনই এশিয়া ও ইওরোপের কিছু কিছু অঞ্চলে সৃষ্টি হয় এক অতি শুষ্ক পরিবেশ। বারিপাতের পরিমাণ ভয়ানকভাবে কমে যাওয়ায় এবং মরুপ্রায় অঞ্চলের সূচনা হওয়ায় উক্ত অঞ্চলের বাসিন্দা মানুষরা খাদ্য ও জলের জন্য উপযুক্ত জায়গা অনুসন্ধানের জন্য একরকম যাযাবরের মতন ঘুরে বেড়াতে শুরু করে। আর তাদেরই অনুসরণ করেছিল কিছু কিছু গবাদি পশু। তার কারণ, মানুষের বসতির কাছাকাছি আগে থেকেই কিছু কিছু গবাদি পশু খাদ্যের লোভে ঘোরাফেরা করতো। মানুষের পরিত্যক্ত ফলের খোসা ও আঁটি, শস্যের খোসা, শস্য ঝাড়াইর পর শুষ্ক তৃণ, গাছ কাটলে গাছের সবুজ পাতা ইত্যাদি হরেক রকমের খাদ্য লোকালয়ে বেশ সুলভ ছিল। তাই মানুষ স্থান ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক পরিবেশে অতিষ্ঠ হয়ে তারাও পেছু নিয়েছিল।

তৃণভোজীদের স্বভাব মানুষের আগে থেকে কিছু কিছু জানা ছিল। এবার তাদের হাতের কাছে পেয়ে স্বার্থচিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। মাংসের জন্য এবং কৃষিকাজে নিয়োগ করতে তাদের লোভ দেখিয়ে গলায় পরিয়ে দিয়েছিল দড়ি। যেহেতু ওরাও দলবদ্ধ হয়ে থাকতে ভালবাসে, তাই অনেকেই পুরো এক একটি দলকে আয়ত্তে এনেছিল এবং বেছে নিয়েছিল পশুচারণ-বৃত্তি। হাতের কাছে মাংসও পেল এবং দুধও পেল। শিকার অবশ্য পরিত্যাগ করলো না। আর এও সত্য যে পশুকে সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করায় নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া হত্যা করতো না।

ঘটনাটি অসম্ভব নাও হতে পারে। রাস্তায় যে হাড়জিরজিরে কুকুরটা মানুষকে দেখা মাত্রই ভয়ে ঘেউ ঘেউ করতে করতে দূরে সরে যায়, তার দিকে কেউ যদি একটু আধ মুঠো খাবার ফেলে দিয়ে আসে তাহলে সেও অনুরক্ত হয়ে পড়ে। প্রথম প্রথম অবশ্য সে কাছে ভিড়তে সাহস করে না। কিন্তু নিয়মিত মাত্র কয়েকবার খাবার দিলে তার ভয় একেবারে ভেঙে যায় এবং ঠিক খাদ্য দেওয়ার সময়টিতে যথাস্থানে

হাজিরও হয়ে যায়।

গবাদি পশুদের আরও একটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যে একটু আদর করে এবং খেতে দেয় তার কথা সে ভুলতে পারে না। আর ভুলতে পারে না তার জন্মস্থানকে এবং পরিচর্যাকারীকে। ভবিষ্যতে অপর জায়গায় কারও অধীনে এলেও এবং পূর্বাপেক্ষা ভাল খাদ্য লাভ করলেও জীবনের শেষদিন পর্যন্তও মনে রাখে প্রথম প্রভুকে। গবাদি পশুর উক্ত স্বভাবকে নিয়ে বহু লেখক বহু গল্প কবিতাও রচনা করেছেন।

উপরোক্ত স্বভাবগুলির জন্য এককালে নিজের চাহিদা অনুভব করায় মানুষ অতি সহজে ওদের পোষ মানিয়েছিল। একদিন মানুষের কাছে পশুর এমন চাহিদা ছিল যে, সব সম্পদের উপর পশুসম্পদকে স্থান দেওয়া হতো।

মানুষ কবে যে এই দুর্লভ সামগ্রীকে হস্তগত করেছিল তার সঠিক সময়টা অতীতের পৃষ্ঠা থেকে কোনকালেই উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। তবে স্বার্থপর মানুষ ব্যাপারটাকে একেবারে লুফে নিয়েছিল এবং অতি অল্পদিনের ভেতরেই বহু দল বা গোষ্ঠী উৎসাহিত হয়েছিল পশুপালন করতে। আর হতভাগ্য ঐসব পশুরা। সেই কোন এক সুদূর অতীত থেকে বংশ বংশ ধরে জীবন উৎসর্গ করতে করতে মানুষের ঋণ শোধ করে যাচ্ছে। পৃথিবীতে যতকাল মানুষ থাকবে ততকাল চলবে পশুদের প্রতি নির্যাতন। খাদ্যের জন্য, বিলাসোপকরণের জন্য এবং কৃষিক্ষেত্রে ওদের ডাক চিরকাল হয়ত অব্যাহতই থাকবে।

মানুষের অতীত ইতিহাসটাকে উদ্ধার করতে আজ গবেষণার অন্ত নেই। ভূগর্ভে প্রাপ্ত নানান নিদর্শন থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন, অন্তত তিন থেকে সাড়ে তিন কোটি বছর আগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল অর্ধবানরাকৃতি মানুষ। তখন ওরা হাতে পাথর কিংবা লাঠি ধরতে পারতো না, মুখে কোন ভাষা ছিল না, এমনকি পুরোপুরি সোজা হয়ে হাঁটতে বা দৌড়াতে পারতো না। ক্রমবিবর্তনের নানা স্তর অতিক্রম করতে করতে আজ থেকে হয়ত পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে তারা কোনওরকমে আলতোভাবে পাথর ধরতে শিখেছিল। তবে এ সময়ও তাদের মুখে ভাষা আসেনি, দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে পারতো না, বা চেহারাটাও আজকের মানুষের মত ছিল না। নানা উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে মাত্র পঞ্চাশ হাজার বছর আগে ওরা দলবদ্ধ হতে পেরেছিল। প্রকৃতপক্ষে সেই থেকেই মানুষ ধীরে ধীরে নানা আবিষ্কারের মাধ্যমে উন্নতিলাভ করতে সমর্থ হয়।

দলবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখে যে ভাষা এসেছিল এমন নয়। নিজের মনের ভাবকে দলের সামনে ব্যক্ত করতো কতকগুলো সঙ্কেতধ্বনি, হাতের ইসারা, ইত্যাদির মাধ্যমে। অপরদিকে সমস্ত মানবজাতিটা নানা দলে ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পৃথক পৃথক ভাবে বাস করতো বলে এক দলের সঙ্কেত অপর দলের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই ছিল। কোন দুটি দলের মধ্যে সদ্ভাবও ছিল না। প্রত্যেক দলই নিজেদের সুবিধা করতে গিয়ে কিছু কিছু আবিষ্কার করতো এবং সে আবিষ্কারগুলি নিজেদের দলের মধ্যেই থাকতো সীমাবদ্ধ। এমনও হয়েছে, উন্নত অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে কোন দল যখনই প্রবল হয়ে উঠেছে তখনই তারা অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ওদের আবিষ্কারগুলিও। আর এই ব্যাপারটা ঘটেছে সহস্র সহস্র বছর ধরে। তাই অনেক-ক্ষেত্রে পুরাতন আবিষ্কারগুলিকে পুনরায় নতুন করে আবিষ্কার করতে

হয়েছে পরবর্তীদের। মানুষ যদি প্রথম থেকে লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারতো তাহলে এমনটি হতে পারতো না।

গবেষকদের অনুমান, মানুষের মুখের ভাষা যখন একেবারে পরিণত হয়ে উঠেছিল তখনও তারা আবিষ্কার করতে পারেনি লেখার পদ্ধতি। অথবা সে সময় যদি কোন দল মনের ভাব প্রকাশের কোন মাধ্যম আবিষ্কার করেছিল তা শক্তিমানের কাছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অপর পক্ষে কেউ চিরটাকাল ধরে শক্তিমান হয়ে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে নি। প্রত্যেকেরই যেমন একদিন উত্থান হয়েছিল তেমনই পতনও হয়েছে। বার বার অবলুপ্ত হয়েছে প্রাচীন সভ্যতা এবং বার বার প্রাচীনের কবরের উপরে গড়ে উঠেছে নববলে বলীয়ানদের সুদৃশ্য ইমারত।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্য লিপির উদ্ভব কবে হয়েছিল এবং কোন্ গোষ্ঠীর দ্বারা সম্ভব হয়েছিল, তা বলা শক্ত। তবে অধিকাংশ গবেষকের অভিমত, লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার একেবারে আধুনিক-কালে। অর্থাৎ বর্ণমালা আবিষ্কার এবং বর্ণমালাকে সাজিয়ে মনের ভাবকে প্রকাশ করার যে বলিষ্ঠ উপায়—তার সূত্রপাত হয়েছে আজ থেকে মাত্র হাজার পাঁচেক বছর আগে। আর এর শৈশব অবস্থা কাটতেও লেগেছে প্রায় হাজার দুয়েক বছরের মত। প্রকৃত বর্ণমালা বলতে যা বোঝায় তা এসেছে খ্রীষ্টজন্মের মাত্র হাজার খানেক বছর আগে বললে মনে হয় অত্যুক্তি হবে না। অবশ্য এক্ষেত্রেও সেই আবিষ্কারও হারিয়ে যাওয়ার পালা আছে। তা না হলে হয়ত আরও কিছুকাল আগে বর্ণমালা আবিষ্কার হতে পারতো এবং মানবসভ্যতাও আরও এগিয়ে যেতে পারতো।

বার বার বিভিন্ন জায়গায় উদ্ভব ও বিলুপ্তির ফলে লিপি আবিষ্কারের ইতিহাসটাও কিছুটা অন্ধকারে ঢাকা। বিবর্তনের কোন্ কোন্ স্তর অতিক্রম করে যে আদিম লিপি বর্ণমালার রূপ গ্রহণ করেছিল তাও বলা কষ্টকর। তবু সবাই একমত যে, কোন দেশের কোন বর্ণমালাই সরাসরি আসতে পারেনি। বহু বিবর্তনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হতে

উদ্ভব হয়েছে আজকের বর্ণমালা এবং এদের আদিরূপ চিত্র।

মানুষ ছবি আঁকতে শিখেছিল দলবদ্ধ হয়ে গুহাবাসের সময় থেকেই। মুখের ভাষা পরিণত না হওয়ায় আপন অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করতো চিত্রের মাধ্যমে।

সে সময় ছবি আঁকতো বিশেষ করে বয়স্করাই। বার্ধক্যের ভারে যারা শিকারে যেতে পারতো না তারা ছেলেমেয়েদের নিয়ে গুহাদ্বার আগলাতো। আর তাদের উত্তরাধিকারীদের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি ব্যক্ত করতো ছবি এঁকে। সে ছবিগুলি ছিল সবই জন্তুজানোয়ারের এবং শিকারের ছবি। যেহেতু তারা ভাবপ্রবণ ছিল না এবং বিপদসঙ্কুল সেই আরণ্য পরিবেশে দু-দণ্ড বসে চিন্তা করারও সময় ছিল না, তাই আজকের দিনের কোন চিত্রকরের আঁকা কোন ছবির মত নয় সেগুলি অরণ্যের পশুদের সম্বন্ধে ছোটদের যাতে একটা ধারণা গড়ে উঠতে পারে তারই প্রচেষ্টা চালাতো এবং তাদের মধ্যে প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী শিকারে বেরিয়ে যাওয়ার আগে মহড়া দেওয়ার জন্য কিছু কিছু শিকারের ছবি আঁকতো।

পরের দিকে আপন মনোভাবকে ব্যক্ত করতে গিয়েও সাহায্য গ্রহণ করেছিল সেই চিত্রের। তবে এ চিত্র প্রকৃত জীবজন্তুর পুরো অবয়ব ছিল না, কতকগুলো আঁচড় কেটে উদ্দিষ্ট পশু কিংবা পাখী অথবা কোন ঘটনাকে সঙ্কেতের সাহায্যে প্রকাশ করতো। প্রস্তর-যুগের একেবারে শেষের দিকে মানুষ এঁকেছিল এইসব ছবি এবং আফ্রিকা, ফ্রান্স, সাইবেরিয়া প্রভৃতি বহু জায়গার গুহা গাত্রগুলিতে এমন ছবি পাওয়া গেছে। পণ্ডিতদের দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ সাঙ্কেতিক চিত্রগুলিই হচ্ছে লিপির পূর্বপুরুষ এবং তাই নামকরণ তাঁরা করেছেন 'চিত্রলিপি'।

উপরের চিত্রলিপিগুলি কালিফোর্ণিয়ায় পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ঐ চিত্রলিপির মত লিপি মনের ভাব প্রকাশের বাহকরূপে অন্যান্য জায়গায়ও বহুদিন ধরে প্রচলিত ছিল। কিছুকাল আগে পর্যন্তও যে সব জায়গা সভ্যসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল সে সব

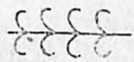
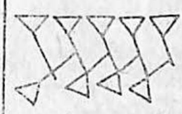
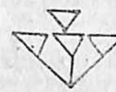
জায়গার অধিবাসীদের মধ্যে অনুরূপ চিত্রলিপিই প্রচলিত ছিল। কেননা আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনকালে পাশ্চাত্যের মানুষ দেখেছিল রেড ইণ্ডিয়ানদের চিত্রলিপির সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করতে।

চিত্রলিপির নানা অসুবিধা ছিল। প্রথম ও প্রধান অসুবিধা, এর দ্বারা মনের ভাবকে যথাযথভাবে তুলে ধরা যেতো না। শুধু কতকগুলো সঙ্কেতের মাধ্যমে অপরকে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়াস ছিল মাত্র। আর বোঝাও ছিল বেশ কষ্টকর। অনেক চিন্তাভাবনার পর ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিতে হতো। দ্বিতীয়ত চিত্রাঙ্কনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া অপরে লিখতে পারতো না এবং পৃথিবীতে যত প্রকারের জীবজন্তু, গাছপালা বস্তু আছে তাদের প্রত্যেকের জন্য দরকার হতো এক একটি সাঙ্কেতিক লিপি। অর্থাৎ যত শব্দ তত লিপি।

আমরা সবাই জানি, কথা বলতে গেলে কতকগুলি ধ্বনির সৃষ্টি হয়। আর ধ্বনির মাধ্যমে নিষ্পন্ন শব্দ সমষ্টিই হচ্ছে মুখের ভাষা। চিত্রলিপিতে ধ্বনির কোন স্থান না থাকায় এবং অপরাপর অসুবিধাগুলিকে দূর করতে মানুষ পরবর্তীকালে ধ্বনিলিপি তথা এক একটি অক্ষরের কল্পনা করেছিল। তবে উক্ত পরিকল্পনা কত শত কিংবা সহস্র বছর পরে যে কার্যকর হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলার কোন উপায় নেই। তবে একটি বিষয়ে সবাই একমত যে, ধ্বনিলিপির জন্ম ঐ চিত্রলিপি থেকেই।

চিত্রলিপি যে ধ্বনিলিপি তথা অক্ষরে রূপান্তরিত হয়েছে, এটি নিছক একটি কল্পনাও নয়। তার প্রমাণ পাওয়া গেছে কীলক লিপিতে। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে কীলক লিপির উদ্ভব হয়েছিল এবং এই লিপির আবিষ্কর্তা ছিল সেদিনের সুমেরীয়রা। একে কিউনিফর্ম লিপিও বলা হয়ে থাকে। নামকরণ করা হয়েছে ল্যাটিন "কিউনিয়াস" ও "ফর্মা" নামক শব্দ দুটি দিয়ে। যাদের বাংলা প্রতিশব্দ যথাক্রমে কীলক ও আকৃতি। উক্ত কারণে বাংলায় বলা হয় কীলকাকার লিপি বা কীলক লিপি।

অনেকের বিশ্বাস, আবিষ্কারের পরে কিউনিফর্ম লিপি মেসোপটেমিয়া থেকে ব্যাবিলন, আসিরিয়, পারস্য প্রভৃতি জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষজ্ঞরা চিত্রলিপি থেকে কীভাবে কীলকলিপির উদ্ভব হয়েছিল তার কতকগুলো নমুনা উপস্থাপিত করেছেন। এখানে একটি নমুনা দেওয়া গেল। নমুনাটি গমের।

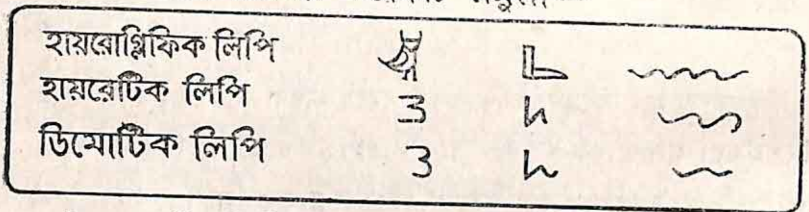
গমের আদি চিত্র লিপি	প্রথম রূপান্তর	দ্বিতীয় রূপান্তর	কীলক লিপি
			

অনেকে মনে করেন, প্রায় একই সময়ে অথবা অল্প কিছুকাল পরে মিশরীয়রা আরও এক ধরনের লিপি ব্যবহার করতো। মিশরে উদ্ভূত এই লিপিটির নামকরণ করা হয়েছে হায়রোগ্লিফিক লিপি। এর অর্থ "পবিত্র রেখা"। সেকালে মিশরীয়দের কাছে এটি "দেবলিপি" নামেও প্রসিদ্ধ ছিল। কারণ, মিশরীয়রা মনে করতো, দেবতারাই এই লিপি ব্যবহার করেন এবং তাঁদের ভাষাকে রূপ দেন উক্ত লিপিতে। ফলে একমাত্র দেবস্থান বা মন্দির, কবরস্থান প্রভৃতি পবিত্র স্থানগুলির পরিচয় প্রদান করতে এবং ধর্মের অনুশাসন প্রচার করতে পাথরের ফলকে অতি সুন্দর করে ঐ লিপিতে লিখে দেওয়া হতো।

হায়রোগ্লিফিক লিপি থেকে পরবর্তীকালে আরও দু'ধরনের লিপির উদ্ভব হয়েছে। একটির নাম হায়রেটিক লিপি এবং অপরটির নাম ডিমোটিক লিপি। এই দুই লিপির উদ্ভবের মূলে কয়েকটি কারণও ব্যক্ত করেছেন পণ্ডিতেরা। প্রথমতঃ হায়রোগ্লিফিক লিপি যেহেতু ধর্মের অনুশাসন লেখা, আত্মার সদ্‌গতি কামনা ইত্যাদি পবিত্র কর্মে ব্যবহার ছাড়া অন্যত্র ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল—তাই ব্যবহারিক কাজকর্ম চালাতে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল অন্যধরনের লিপি। দ্বিতীয়তঃ প্রস্তর ফলককে সুদৃশ্য করার অপর আর একটি উদ্দেশ্য থাকায় লিপিগুলির প্রত্যেকটি ছিল অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতকগুলো রেখার

সমন্বয়ে এক একটি জটিল লিপি—যা সবার পক্ষে লেখা একেবারে অসম্ভব ছিল। তাই ব্যবহারিক চাহিদা মেটাতে ডাক পড়েছিল অন্য লিপির এবং সেগুলি কালক্রমে জন্মগ্রহণ করেছিল হায়রোগ্লিফিক লিপি থেকে। প্রথম পর্যায়ে উক্ত লিপি থেকে হায়রেটিক লিপির উদ্ভব হতে সময় লেগেছিল প্রায় দেড় হাজার বছর এবং পরে হায়রেটিক লিপি থেকে ডিমোটিক লিপির উদ্ভব হয় খ্রীষ্ট জন্মের মাত্র সাতশ বছর আগে। অপর পক্ষে ঐ তিন লিপির প্রচলন খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

তিন লিপির কয়েকটি নমুনা—



উপরোক্ত তিন লিপি আবিষ্কার ও পাঠের মূলে একটি বিশেষ ঘটনা আছে। ১৭৯৯ সালে নেপোলিয়ন মিশরে যে অভিযান প্রেরণ করে ছিলেন তার দলনেতা ছিলেন এম. বুসা। তিনি মিশরে এসে দলবল নিয়ে রসেটা নামক একটি দুর্গে অবস্থান করেন। একসময় ঐ দুর্গে রক্ষিত একটি প্রস্তরফলক তাঁর দৃষ্টিগোচরে আসে। পাথরটিকে হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে তাঁর মনে হল, এক অজানা ভাষায় কীসব যেন লেখা আছে পাথরের গায়ে।

নেপোলিয়নের মিশর অভিযান অবশ্য ব্যর্থ হয়েছিল। বুসা ফিরে আসেন ফ্রান্সে কিন্তু প্রস্তর ফলকটিকে পরিত্যাগ করেননি। স্বদেশের পণ্ডিতদের ওর ভাষা পরীক্ষার জন্য প্রদান করেন।

পণ্ডিতেরা প্রথম প্রথম হাজার চেষ্টা করেও ওর মর্মোদ্ধার করতে পারেননি। শেষে ১৮০১ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ টমাস ইয়ং, সুইডেনের জে. ডি. আকের ব্লাড, ফ্রান্সের সিলভেস্তর দ্য সাকি প্রভৃতি পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় ফলকটি পাঠ করা সম্ভব হয়। সেই সঙ্গে উন্মোচিত হয় অতীতের মানবগোষ্ঠীর একটি বিশেষ তৎপরতা।

প্রস্তর ফলকটির নামকরণ করা হয়েছে রসেটা ফলক। এটি লেখা হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ১৯৬ অব্দে এবং এটি পঞ্চম টলেমী এপিফানেসের সম্মানার্থে একটি ঘোষণাপত্র। লেখা হয়েছে মোট ১০০ লাইন। প্রথম ১৪ লাইন লেখা হয়েছে হায়রোগ্লিফিক লিপিতে, দ্বিতীয় ৩২ লাইন ডিমোটিক লিপিতে এবং শেষ ৫৪ লাইন গ্রীক লিপিতে। এখন এটিকে সংরক্ষিত করা হয়েছে বৃটিশ মিউজিয়ামে।

মিশরে প্রাচীন ঐ লিপিগুলি হারিয়ে গেলেও অনেকের বিশ্বাস, পরবর্তীকালে উদ্ভূত লিপিগুলি অনেকখানি ঋণী ওদের কাছে। পরস্পর-বিরোধী দুটি মতবাদও আছে। একদলের মতে হায়রো-গ্লিফিক লিপি চিত্রলিপি থেকে এসেছে এবং অপরদলের মতে প্রাচীন মিশরীয়রা বিভিন্ন জায়গায় প্রচলিত কিছু কিছু লিপিকে আত্মসাৎ করেছিলেন।

অনেকের বিশ্বাস মিশরে হায়রোগ্লিফিক লিপির উদ্ভবের সময় সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীরাও একধরনের লিপি ব্যবহার করতো। উক্ত লিপির প্রায় তিনশ'টির মত নমুনা পাওয়া গেছে। কিন্তু এখনও পাঠ করা সম্ভব হয়নি। গবেষণার ফলে স্থির হয়েছে, এগুলি পুরোপুরি চিত্রলিপি নয়। আংশিক চিত্রলিপি এবং আংশিক ধ্বনিলিপি।

কারও কারও ধারণা, ঐ লিপি থেকে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হয়েছিল এবং ঐ ব্রাহ্মীলিপি ভগবান গৌতম বুদ্ধের সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। তারপরেই হারিয়ে গেছে।

কিউনিফর্ম, হায়রোগ্লিফিক এবং সিন্ধু সভ্যতার লিপিগুলির মধ্যে কোন্‌টি যে প্রাচীন তা এখনও সঠিকভাবে বলার কোন উপায় নেই। কোন একটি বিশেষ লিপি ওদের সবার উৎস কিনা, কিংবা প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল কিনা তাও বলা যায় না।

আধুনিক গবেষকদের বিশ্বাস, উপরোক্ত তিন লিপির কোনটিই বর্ণমালার লিপি ছিল না। যেহেতু বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণ বাকযন্ত্র থেকে উৎসারিত এক একটি বিশুদ্ধ শব্দকে নির্দেশ করে থাকে এবং

এতে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি, উভয় ধ্বনিরই প্রতীক থাকে। হায়রোগ্লিফিক প্রভৃতি লিপিতে ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতীক থাকলেও স্বরধ্বনির প্রতীক নেই। তাছাড়া আছে অর্থবোধক কিছু কিছু চিহ্ন। অপরদিকে সংখ্যায়ও এরা অনেক বেশী। তাই গবেষকদের ধারণা, এরা কোনটিই আক্ষরিক লিপির পর্যায় পর্যন্ত উন্নীত হতে পারেনি। ব্যতিক্রম যে নেই এমন নয়। কিছু কিছু পণ্ডিত মনে করেন, পাশ্চাত্যের বর্ণমালা হায়রোগ্লিফিক লিপি থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছিল, অর্থাৎ এঁদের মতে মিশরই সৃষ্টি করেছিল বর্ণমালা। তবে অধিকাংশ গবেষকের মত, প্রকৃত বর্ণমালার জন্মস্থান প্রাচীন সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন।

পৃথিবীতে কোন কিছু স্বয়ম্ভু নয়। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মত বর্ণমালার ক্ষেত্রেও আছে সুদীর্ঘকালের তৎপরতা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তাই সিরিয়ায় আবিষ্কৃত বর্ণমালাও সহসা স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। এর পেছনেও আছে আদিকালে উদ্ভূত বিভিন্ন লিপি। সেগুলির কোন কোনটির একটু হদিশ পাওয়া গেছে, আবার কারও কোন নমুনা এখনও হস্তগত হয়নি। যেগুলি হস্তগত হয়েছে তাদের মধ্যে হায়রোগ্লিফিক লিপি ছাড়া আছে সিনাই উপদ্বীপে প্রাপ্ত সিনাইটিক লিপি, ক্রীট দ্বীপে প্রাপ্ত ক্রীটান লিপি, সিরিয়ায় প্রাপ্ত ইউগারিট কিউনিফর্ম লিপি, সিরিয়ার বিব্লস নামক স্থানে প্রাপ্ত বিব্লস লিপি, প্যালেস্টাইনে প্রাপ্ত ক্যানানাইট লিপি এবং সাইপ্রাস ও সিরিয়ায় প্রাপ্ত সেমিটিক লিপি প্রধান। বিবর্তনের মাধ্যমে উক্ত লিপিগুলি থেকে প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশের বর্ণমালা এসেছে এবং এদের প্রধান উৎস হচ্ছে সেমিটিক লিপি।

পণ্ডিতদের মতে, এককালে সেমিটিক লিপি এসেছিল বিব্লস লিপি এবং ক্যানানাইট লিপিকে ভিত্তি করে। বিব্লস লিপির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল ফিনিশীয়রা এবং প্রচলিত অন্যান্য লিপি থেকে তারা একধরনের স্বতন্ত্র বর্ণমালা আবিষ্কার করেছিল—যার প্রভাব গ্রীক

বর্ণমালায় বেশ স্পষ্ট। অপরদিকে ক্যানানাইট বর্ণমালার উদ্ভব সিনাইটিক লিপি থেকে। আর বিব্লস ও ক্যানানাইট লিপির প্রভাব পড়েছে সেমিটিক বর্ণমালার উপর। দু'ধরনের সেমিটিক বর্ণমালারও হদিস পাওয়া গেছে। উত্তর সেমিটিক ও দক্ষিণ সেমিটিক। ঐ উত্তর সেমিটিক লিপির একটি শাখা জন্ম দিয়েছে হিব্রু, আরবীয় ও ভারতীয় বর্ণমালার এবং অপর শাখাটি থেকে উৎপন্ন হয়েছে আধুনিক ইউরোপীয় বর্ণমালাগুলি।

উত্তর সেমিটিক বর্ণমালার বহু নিদর্শন লাভ করা গেছে। এটিও এগিয়ে গেছে নানান রূপান্তরের মাধ্যম দিয়ে। এর সুপ্রাচীন নমুনা "আক্কো" লিপি—উদ্ভবকাল খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দী। কয়েকটি নমুনা—

K, q, 4, Z, Y, L, O = [ইংরাজী পাঠ - A B D,Y,K,L D]

আক্কো থেকে উৎপন্ন হয়েছে শাফাৎবাল লিপি ও পরে আসদ্রুবাল লিপি। ওদের সময়কাল যথাক্রমে খ্রীষ্টপূর্ব ১৭ দশ ও খ্রীষ্টপূর্ব ১৪শ শতাব্দী।

শাফাৎবালের নমুনা	K K, q, △, Z, Y, L, O [A,B,D,Y,K,L,O]
আসদ্রুবালের নমুনা	K, 4, Z, ↓, L, O [A,B,Y,K L,O]

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দী থেকে এদের কিছু কিছু পরিবর্তন হতে থাকে এবং সেই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীতে এলিবাল ও আবিবাল লিপিতে, খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে লেখা মোয়াবাইট প্রস্তর ফলকে এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীতে ফিনিশীয় লিপিতে। পূর্বের মত ইংরাজী **A, B, D, Y, K, L** ও **O** পাঠের

বর্ণমালাগুলির আদিলিপির নমুনা নিম্নে প্রদান করা হল।

অ্যাব্বিবাল লিপি-	K, 9, 7, Δ, Z, ↓, ⅃, O,
মোয়াবাইট ফলকের লিপি-	K, 9, 7, Δ, Z, Ұ, L, O,
ফিনিশীয় লিপি	- K, 9, Ɣ, Z Ӽ L, O
পরে উদ্ভূত প্রাচীন গ্রীক লিপি-	A, 8, Δ, Z Ӽ 7, O
আধুনিক ইংরাজী	A, B, D, Y, K, L, O

ফিনিশীয় লিপি থেকে গ্রীক লিপির জন্ম এবং গ্রীক লিপি থেকে জন্ম আধুনিক ইওরোপীয় লিপিগুলি। সুপ্রাচীন উপরোক্ত লিপিগুলির উপর বিব্লস লিপি যে ছাপ ফেলেছিল এবং কিছু কিছু যে সরাসরি এসেছিল তারও নমুনা এখানে দেওয়া গেল।

বিব্লস লিপি -	A, Z, 4, ʑ, ↓, ∠, O.

এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, উত্তর সেমিটিক বর্ণমালার ২২টি অক্ষর ছিল এবং প্রতিটি ছিল ব্যঞ্জনবর্ণ। এতে কোন স্বরবর্ণ ছিল না। গ্রীকরাই মনে হয় প্রথম স্বরধ্বনি যোগ করার পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। তার প্রমাণ হিসাবে হিব্রু বর্ণমালার উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

গ্রীক আলফা (α), বিটা (β), গামা (γ), ডেলটা (δ), প্রভৃতি শব্দগুলির হিব্রু উচ্চারণ আলেফ, বেথ, গিমেল ও ডালেথ প্রভৃতি। আগের সেই ব্যঞ্জনধ্বনির প্রাধান্য আজও হিব্রু বর্ণমালায় বহুলাংশে রক্ষিত বলেই মনে হয়। অপর দিকে চিত্রের প্রতীক তথা চিত্রলিপি থেকে যে বর্ণমালার উদ্ভব তাও প্রমাণ করে হিব্রু বর্ণমালা। যেমন আলেফ অর্থে বৃষ, বেথ অর্থে বাড়ী, ডালেথ অর্থে দরজা, ইত্যাদি।

কোন কোন পণ্ডিতের আরও অভিমত, সেমিটিক বর্ণমালার প্রাচীন-

রূপ প্রোটো সেমিটিক। এর উদ্ভবকাল খ্রীষ্টজন্মের দু হাজার বছরেরও আগে—তথা হিক্‌কস নামে বিশেষ একটি মানবগোষ্ঠীর উত্থানের সময়ে। এই হিক্‌কসরাই লোহা আবিষ্কার করেছিল এবং পরবর্তীকালে এমন প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, এদের দ্বারা অধিকাংশ নগর-সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। গবেষকরা অনুমান করেন, হিক্‌কসদের উন্নতির সময় মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে প্রচণ্ড এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে সূচিত হয়েছিল নানা পরিবর্তন।

হিক্‌কসদের আবির্ভাবের স্থানটির তথা সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের ভৌগোলিক অবস্থানটিও ছিল তৎকালীন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ এর দুদিকে ছিল দুটি সুসভ্য দেশ, মেসোপটেমিয়া ও মিশর। বাণিজ্যিক ও অন্যান্য কারণে সভ্যদেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগের একেবারে সেতুস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন। ফলে ঐখানে অন্যান্য তৎপরতার সঙ্গে বর্ণমালারও সংস্কার শুরু হয়েছিল। তারপর এই বর্ণমালা ফিনিশীয়দের হাতে আসে। ফিনিশীয়রা ছিল দুর্দান্ত ব্যবসায়ী। জলপথে নানা দেশের সঙ্গে তারা ব্যবসা করতো এবং নিজেদের সুবিধার জন্য ঐ বর্ণমালাকে আরও সংস্কার করেছিল। তারপর ফিনিশীয়দের বর্ণমালাকে ভিত্তি করে গ্রীক পণ্ডিতেরা নতুন বর্ণমালার প্রবর্তন করেন। উক্ত বর্ণমালার আদিরূপটি কতকাংশে কোন কোন হিব্রু-বর্ণে আজও বর্তমান।

এবার আমাদের ভারতীয় বর্ণমালার কথায় আসা যেতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতীয় বর্ণমালার আদি ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ কতকগুলো অনুমান খাড়া করা হয়েছে মাত্র।

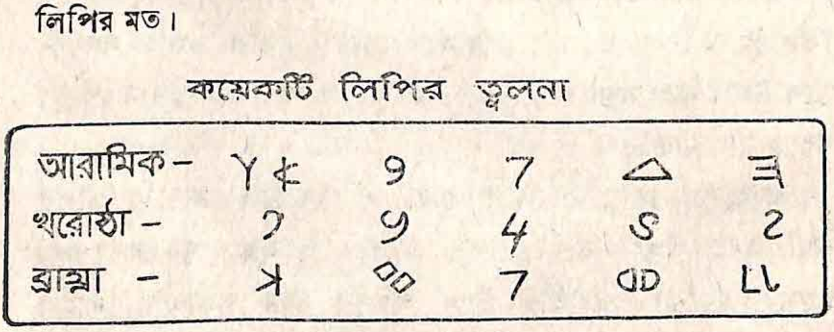
ভারতের সুপ্রাচীন লিপি ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী। খরোষ্ঠী লিপির কথা অবশ্য উদ্ধার হয়েছে কিন্তু ব্রাহ্মীলিপি সম্বন্ধে খুব বেশী তথ্য হস্তগত হয়নি। খরোষ্ঠীর উদ্ভব খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর দিকে। উৎপন্ন হয়েছিল উত্তর সেমিটিক শাখার আরামিক বর্ণমালা থেকে এবং

এটি লুপ্ত হয়ে গেছে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শতাব্দীতে।

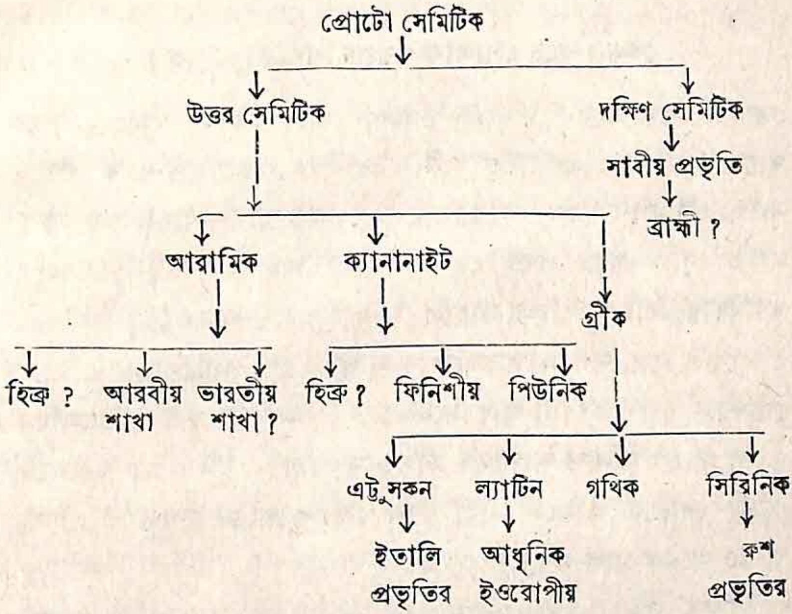
ব্রাহ্মীলিপি সম্বন্ধে সবাই একমত নন। এটি পঠিত হয়েছে এবং আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দী বলে ধরা হয়েছে। কেবল উৎস বিচার করতে গিয়ে সবাই একমত হতে পারছেন না। কেউ কেউ ভাবেন, ব্রাহ্মীর উপর সিন্ধু-সভ্যতার লিপিগুলোর প্রভাব আছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, এই লিপি ভারতে স্বাধীনভাবে আত্ম-প্রকাশ করেছিল। আবার কারও কারও মতে এটি দক্ষিণ সেমিটিক শাখার সাবীয় বর্ণমালা থেকে এসেছে। নানা মুনির নানা মত। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে ব্রাহ্মীলিপিরও উদ্ভব হয়েছে সেই সেমিটিক শাখার আরামিক বর্ণমালা থেকে।

আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির উদ্ভব হয়েছে সংস্কৃত থেকে। সংস্কৃত লোকমুখে পরিবর্তিত হতে হতে একদিন প্রাকৃতের জন্ম হয়েছিল, পরে প্রাকৃত থেকে এসেছে আধুনিক ভাষাগুলি। তেমনই লিপির ক্ষেত্রেও সব ভাষার বর্ণমালা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত হয়েছে। পণ্ডিতদের ধারণা, সংস্কৃত বর্ণমালা এসেছে ঐ ব্রাহ্মীলিপি থেকে। তবে সরাসরি ওকে গ্রহণ করা হয়নি। সেদিনের আর্যরা ওকে ভালভাবে সংস্কার করেছেন এবং ভাব প্রকাশের উপযোগী করে তুলতে একেবারে ঢেলে সাজিয়েছিলেন। ফলে এক অনবদ্য লিপির সৃষ্টি হয়েছিল এবং যার তুলনা খুব কমই আছে। যে বা যাঁরা এই কাজটি করেছিলেন তাঁদের কাজেরও কোন তুলনা হয় না। ভারতে এই লিপিটিও একদিন পরিচিত হয়েছিল দেবলিপি নামে—সেই মিশরের হায়রোগ্লিফিক লিপির মত।

কয়েকটি লিপির তুলনা



যেভাবে বিভিন্ন দেশের আধুনিক বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছে—



কেমন করে পোশাক পরতে শিখলো মানুষ ?

তোমরা কত হরেক রকমের পোশাক-আশাকই না ব্যবহার করে থাকো! কিন্তু একবারও কী ভেবে দেখেছো, পোশাক পরার ব্যাপারটা মানুষ কেমন করে শিখলো ? কেউ কী শিখিয়েছিল তাকে ? নাকি বুদ্ধি খরচ করে সে নিজে নিজেই আবিষ্কার করেছিল ? আবিষ্কারই যদি করেছিল, তাহলে সে কবে এবং কেমন করে ?

কেউ বলে, ভগবান মানুষকে যখন পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন তখন পোশাক পরার কথাটা বলে দিয়েছিলেন। আবার কেউ বলে, সেদিন তূলো গাছের ঢুলিতে আপনিই কাপড় ফলতো। ঢুলি পেকে ফেটে গেলে বেরিয়ে আসতো ইয়া লম্বা লম্বা কাপড়ের ফালি। এমনই আরও অনেক গাল-গপ্পো আছে।

কিন্তু এসব কথা আদৌ ঠিক নয়। ভগবান মানুষকে পৃথিবী শাসন করার জন্য পাঠাননি—পৃথিবীর জীবজগতের কোটি কোটি বছরের নানা রূপান্তরের ভেতর দিয়ে এসেছে সে। আর তূলো গাছে কখনও কাপড় ফলতো না। পোশাক তৈরি করা এবং তাকে গায়ে জড়ানো মানুষকে রীতিমত আবিষ্কারই করতে হয়েছে।

এমন একসময় গেছে, যখন কোন কিছুকে গায়ে জড়ানোর কথা মানুষ ভাবতেই পারতো না। অপর সমস্ত জন্তুজানোয়ারের মত আদুড়গায়ে একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেড়াতো। লজ্জা নিবারণের কথা মনেই আসতো না তাদের এবং স্বভাবে ও আচার আচরণে পশুদের সঙ্গে তাদের খুব একটা তফাৎও ছিল না।

এইভাবে কত লক্ষ লক্ষ বছর যে মানুষ কাটিয়েছে তার হিসেব খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেকালে তাদের কাজ কী ছিল জানো ? বনে বনে সারাটা দিন ঘুরে বেড়ানো আর শিকারের উপযোগী কোন পশুকে দেখলে তাকে ঘায়েল করা। গাছের কচি কচি পাতা, ফল-পাকুড়, পিঁপড়ে ও বোলতার চাক ইত্যাদিও সংগ্রহ করতো। শুধু

পেটের চিন্তা—এই আর কী! পাখীদের মত রাতটাই কেবল বিশ্রাম করতো কোন গর্তে বা গাছের ডালে। সকাল হলে ছুট, ছুট, ছুট; চাই খাদ্য, চাই খাদ্য, চাই খাদ্য!

এমনি করে হয়ত চিরটাকাল চলে যেতে পারতো মানুষের। কিন্তু বাদ সাধলো স্বয়ং প্রকৃতি। আজ থেকে হাজার পঞ্চাশেক বছর আগে পৃথিবীর যেসব এলাকায় মানুষ এসেছিল সেই এলাকাগুলিতে প্রবাহিত হতে শুরু করলো কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। তুষারপাত চলতে থাকলো এবং কোন কোন জায়গা বরফে বরফে ঢাকাও পড়লো। কষ্টের আর সীমা-পরিসীমা থাকলো না মানুষের।

ব্যাপরটা কিন্তু চলেছিল হাজার হাজার বছর। কত জনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। যারা কোনরকমে টিকে রইলো তারা উপায় খুঁজতে লাগলো শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। শেষে বুদ্ধি খরচ করে আশ্রয় গ্রহণ করলো পাহাড়ের গুহাগুলোতে।

কিন্তু গুহার ভেতরে কী চুপচাপ বসে থাকার উপায় ছিল? অথবা গাছের শুকনো পাতা গায়ে চাপিয়ে শুয়ে থাকার? খাবেটা কী?

তাই শীতে যত কষ্ট হোক না কেন, তাদের বেরুতে হতো শিকারের আশায়। দল তখনও তারা বাঁধেনি, কেবল এক একটা পরিবার এক-সঙ্গে থাকতো। দুপুরের দিকে একটু ঠাণ্ডা কমলে যখন ওরা শিকারে বেরুতো তখন দেখতো, বরফের উপর দিয়েও দিব্যি তর তর করে এগিয়ে যাচ্ছে পশুরা। এমন হাড় কাঁপানো শীতেও অসুবিধা বোধ করছে না এতটুকু।

যেহেতু প্রয়োজনই হচ্ছে আবিষ্কারের গোড়ার কথা। তাই সেই ভয়াবহ পরিবেশে তাদের মাথায় একটা কথাই উদয় হয়েছিল, নিশ্চয়ই গায়ে লোম থাকার জন্য পশুরা শীতে অসুবিধা বোধ করে না! আর শীত নিবারণের একটিমাত্র উপায় হচ্ছে, পশুর চামড়া গায়ে জড়ানো।

পশুর চামড়ার কিন্তু অভাব ছিল না তাদের। খাদ্যের জন্য চিরটাকাল তারা পশুশিকার করে আসছে। আগুন জ্বালাতে না শেখায় কাঁচা মাংস খেতো এবং খাওয়ার উপযুক্ত নয় বলে লোমসহ

চামড়াটাকে ফেলে দিতো। এবার বুদ্ধি করে এক একখানা শুকনো চামড়া জড়িয়ে নিল গায়ে এবং সেই প্রথম অঙ্গকে আচ্ছাদিত করার উপায় আবিষ্কার করলো।

এবার থেকে পশুর চামড়াকে আর নষ্ট করলো না মানুষ। বরং অতিরিক্ত আরাম আনতে ভালুক প্রভৃতি লোমশ জন্তুদের শিকার করতে শুরু করলো। এবার মানুষের কাছে একটা বড় সম্পদ হয়ে উঠলো পশুর চামড়া।

প্রথম প্রথম মানুষ মাত্র একটি চামড়াকেই সারা গায়ে জড়িয়ে ফেলতো বা আচ্ছা করে লতার বাঁধনে বেঁধে ফেলতো। এতে যে ভয়ানক অসুবিধা হতো তা বেশ বুঝতে পারছো তোমরা। মানুষও কিছুকাল পরে বুঝতে পেরেছিল। আর বুঝতে পেরেছিল বলেই চামড়ার ফালি কেটে এবং ফালিগুলোকে পাথরের সূচ অথবা গাছের কাঁটা দিয়ে ফুঁড়ে ফুঁড়ে সেলাই করেছিল ঐ চামড়ারই দড়ি দিয়ে। আপাদমস্তক ঢাকা পড়লো চামড়ায় এবং এতদিনে এল স্বস্তি।

তারপরও কেটে গেল কতকাল! প্রায় বিশ হাজার বছর। এত-দিনে পৃথিবীর পরিবেশটাও পাল্টে গেল। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার পরিবর্তে বইতে শুরু করলো ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়া। গুহার ভেতরে বাস করলেও ততদিনে মানুষ অনেকটা সভ্য হয়ে উঠেছে। আগুন জ্বালতে শিখেছে, রান্না করতে শিখেছে, পাথরের হাতিয়ারকে মসৃণ করেছে, এমনকি এক একটা সমাজও গড়ে তুলেছে। পাখী ডাকা সুন্দর সকালের মত সেদিনের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এলো। কিন্তু হাজার হাজার বছরের অভ্যাসটা ছাড়তে পারলো না। অধিকন্তু লজ্জা নিবারণের প্রশ্নটা জোরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। সেই পোশাকই বহাল রইলো। তবে বাহুল্য হলো বর্জিত। সুন্দরভাবে চামড়াকে কেটে সূচ দিয়ে সেলাই করে হাফ-প্যান্টের মত কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখলো।

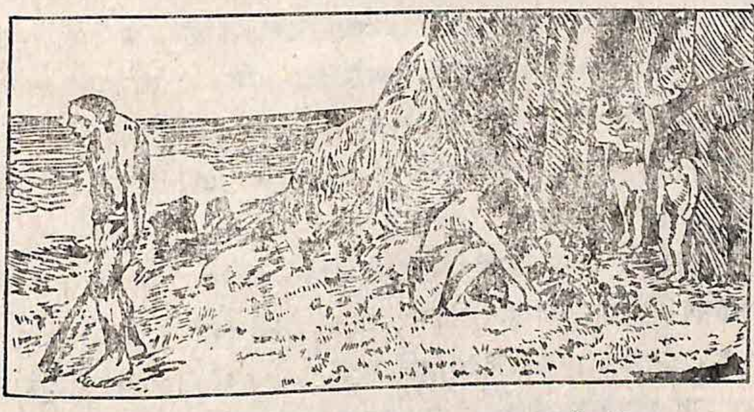
প্রথম প্রথম নারী ও পুরুষ উভয়েরই ছিল একই ধরনের পোশাক—সেই হাফপ্যান্টের মত। পরে নব্য প্রস্তরযুগের মধ্যভাগে মেয়েরা

একফালি চামড়া কেটে কাঁচুলির মত বুকেও বেঁধে নিল।

নব্য প্রস্তরযুগে মানুষ যাযাবর বৃত্তিই অবলম্বন করেছিল। আজকের মানুষ অপেক্ষা অনেক—অনেক অনুসন্ধিৎসু ছিল তারা। তাই একদিন সে আবিষ্কার করে পাটজাতীয় গাছের তন্তু এবং তূলোর আঁশ। আর পেয়েছিল নানা ধরনের সরু সরু কোমল তৃণ। বুদ্ধি করে এবার সূতো তৈরি করলো, দড়িও তৈরি করলো। বিশ্রী সেই পশুর চামড়াকে গায়ে জড়াতে ঘৃণা বোধ করলো মানুষ। পরিবর্তে তৃণ অথবা মোটা দড়ির বিনুনি দিয়ে এক এক ফালি কাপড়ের মত করে নিল। অবশেষে আরও সুবিধা ও আরাম আনতে মাত্র খ্রীষ্ট-জন্মের হাজার চারেক বছর আগে সূতো দিয়ে কাপড় তৈরি করেছিল।

তাঁত আবিষ্কৃত না হওয়ায় সেদিন এক একখানা কাপড় তৈরি একটা বড় সমস্যা ছিল। বহু যত্নে এবং পরিশ্রমে কেবলমাত্র কোমরে জড়াবার উপযোগী এক টুকরো ছোট্ট কাপড়ই তৈরি করতো। তার প্রমাণ পাওয়া যায় মিশরের প্রাচীন ছবিগুলিতে। তিন হাজার বছর আগে পর্যন্ত রাজ-রাজড়ারাও কাপড় পরতেন হাঁটুর একটু তলা পর্যন্ত। গায়ে কেউ একটা উড়নির মত ফেলতেন কেউ বা ফেলতেন না। তবে রাণীদের গায়ে অপেক্ষাকৃত বেশী কাপড় থাকতো।

পরের দিকে তাঁতের উদ্ভাবন হলে পোশাক-আশাকের ব্যাপারে যুগান্তর আসে। তবে পশুর চামড়ার যুগ যে একেবারে ফুরিয়ে গেছে—এমন নয়।



গুহামধ্যে আদিম পশুচর্মাবৃত মানুষের একটি পরিবার

রুমাল

ছোট্ট চারকোণা একখানা কাপড়ের টুকরো—নাম রুমাল। অতি সাধারণ, অতি পরিচিত, অতি অল্পদামী। জৌলস বলতে আদৌ নেই। তবু মুখ মুছতে, হাত মুছতে, গায়ের ঘাম মুছতে এর কী কোন জুড়ি আছে? রুমাল ব্যবহার করে না—এমন লোকও খুঁজে পাওয়া দুরূহ। ভাবছো নিশ্চয়ই, অনবদ্য এই জিনিসটার পরিকল্পনা প্রথম কোন্ শিল্পীর মাথায় এসেছিল!

না, শিল্পীর কথা কারও জানা নেই। ওর ব্যবহার অনেক—অনেক আগে থেকে চলে আসছে কিনা! সেই কোন্ কালে—যেকালে মানুষ গুহায় বাস করতো, কাপড়ের বদলে পশুর চামড়া পরতো, বনে বনে শিকারের আশায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতো, পাথর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ঘামে ভিজে সপসপ করতো, সেই কালেই মানুষ অনুভব করেছিল—গা-মোছার জন্য এমন একটা জিনিস দরকার, যা হবে অতি মোলায়েম, হালকা এবং আকারে ছোট্ট। আর গায়ের ঘামটাও শুষে নিতে পারবে।

হায়রে হায়, তেমন জিনিস পাবে কোথা থেকে? তবু বুদ্ধি খরচ করে গা-মোছার একটি উপকরণ তারা আবিষ্কার করেছিল। সেটি কী ছিল জানো? ভুঁড়ো শেয়ালের লেজ। শেয়াল তারা মারতো এবং খেতোও। আর লেজগুলোকে কেটে রেখে দিত। তারপর একটা লাঠির ডগায় আচ্ছা করে বেঁধে দিত গোটা চারেক শেয়ালের লেজকে। গরম বোধ করলে পাখার মত নেড়ে নেড়ে হাওয়া খেতো এবং ঘাম ঝরলে ঘামকে মুছতো।

ভাবছো বুঝি মিছে কথা? না। এখনও বনে বনে যেসব আদিবাসী লোকেরা ঘুরে বেড়ায়, তাদের কেউ কেউ ঐ ঝাড়নের মত পশুর লোম বা পাখীর পালক দিয়ে তৈরি একটা জিনিস গা-মুছতে ব্যবহার করে। কাউকে কাউকে আবার ঘাসের তৈরি এতটুকুন একটা

মাদুরের মত জিনিসকে মাথায় জড়িয়ে রাখতে দেখা যায়। রোদে-জলে যাঁরা খাটাখাটুনি করেন তাঁরা যেমন মাথায় একটা গামছা জড়িয়ে রাখেন—ঠিক তেমনটি। আদিবাসী লোকেরা ঐ মাদুর দিয়ে হাওয়া করে, হাত মুছে, মুখও মুছে।

প্রাচীনকালে মানুষ যখন পশুর চামড়া ছেড়ে গাছের বাকল পরলো কিংবা ঘাসের তৈরি কাপড় পরলো তখন শেয়ালের লেজকে একেবারে বাদ দিয়ে দিল। তার বদলে আজকের আদিবাসীদের মত ঘাসের তৈরি একটুকরো কাপড় তৈরি করে মাথায় জড়ালো। তারপর যখন সত্যি সত্যি সুতো দিয়ে কাপড় তৈরি করতে পারলো তখন গা মোছা, হাত মোছা, প্রয়োজন হলে বাতাস করতেও ব্যবহার করলো একটুকরো কাপড়কে। তবে সেটি নিতান্ত ছোট ছিল না। রুমাল না বলে গামছাই বলতে হবে।

কাপড়ের তৈরি বড় বড় গামছা বা তোয়ালের মত জিনিসটা প্রথম কারা ব্যবহার করেছিল জানো? গ্রীকরা। তাঁরা রুমালের মত ব্যবহার করলেও আসলে রুমাল ছিল না। তোয়ালেই ছিল।

ছোট আকারের কাপড়ের টুকরোকে প্রকৃত রুমাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন রোমানরা। ওরা ছিলেন ভারি সৌখিন ও বিলাসী। ঝকঝকে পরিষ্কার একটা চারকোণা রুমাল তাঁরাই প্রথম হাতে করে ঘুরে বেড়াতেন। আর তাঁরাই প্রথম রুমালকে চারকোণা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন খুব বিত্তশালী, তাঁরা লিনেন বা শনের তৈরি বড়গোছের চারকোণা রুমাল গায়ে বেঁধে তবে পোশাক চাপাতেন।

রুমালকে আরও ছোট্ট, আরও মার্জিত এবং আরও সুশ্রী করার রীতি ফরাসীরা প্রচলন করেন খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। রোমানদের আমল থেকে ডিম্বাকার, আয়তাকার ও বর্গাকার—এই তিন আকারের রুমাল তৈরি হতো। ফ্রান্সের রাজা ও অভিজাতরা রোমানদের চেয়ে কম সৌখিন ছিলেন না। তাই তাঁরা করলেন কী? খুব সরু সরু ফিতে দিয়ে পছন্দ ও রুচিমত নানা আকারের

রুমাল তৈরি করিয়ে আনতেন এবং রুমালের চারদিকে দামি দামি হীরে ও মুক্তোর মালাকে চমৎকার করে বেঁধে দিতেন।

রুমাল জনপ্রিয় হয়ে উঠে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এ পর্যন্ত মেয়েরা কেউ রুমাল ব্যবহার করতেন না। এবার তাঁরাও শুরু করে দিলেন ব্যবহার। তবে মেয়েদের রুমাল তৈরি হতো রঙীন কাপড় দিয়ে।

তখন ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন চতুর্দশ লুই। তাঁর স্ত্রী মেরি আঁতোয়ানেৎ ছিলেন যেমন বিলাসী তেমনই সৌখিন। খেয়ালিও বড় কম ছিলেন না। তাঁর মাথায় একদিন খেয়াল চাপল, রুমাল প্রকৃত বর্গাকার হওয়া উচিত। ডিম্বাকার ও আয়তাকার রুমাল—একেবারে যাচ্ছেতাই।

রাণী সম্রাটকে খুব করে বোঝালেন। শেষে রাণীর অনুরোধে রাজা আইন করলেন, আজ থেকে আয়তাকার বা ডিম্বাকার রুমাল কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। সবাইকে ব্যবহার করতে হবে বর্গাকার রুমাল। আর যত কারিগরি—ঐ বর্গাকার রুমালের উপরই প্রয়োগ করতে হবে।

ব্যস! সেই থেকে ফ্রান্সে প্রচলিত হলো বর্গাকার রুমাল। দেখতে দেখতে পৃথিবীর সব দেশেই ছড়িয়ে পড়লো অনুরূপ রুমালের ব্যবহার। বর্তমানেও আমরা সেই বর্গাকার রুমালকেই ব্যবহার করি।

ছাতা

কোন এক বর্ষার দিনে দোতালার জানালা দিয়ে যখন কোন বড় রাস্তার দিকে তাকাও, তখন কী চোখে পড়ে তোমাদের ?

কেবল কালো কালো ছাতার শোভাযাত্রা। খুব মজাও পাও তোমরা। কিন্তু ভেবে দেখেছো কী ঐ ছাতার আদি রূপটা কেমন ছিল ? প্রথম কে বা কারা ওকে তৈরি করেছিল ?

ছাতার প্রকৃত আবিষ্কার যে কে, সেকথা কেউ বলতে পারবে না। অতি পুরনো দিনের আবিষ্কার তো ? তাই শিল্পীর কথা জানা নেই কারও। অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছেন শিল্পী।

আদিকালে মানুষের আঁকা ছবিগুলি দেখে মনে করা হয়, ছাতার ব্যবহার শুরু হয়েছে সেই পুরাতন নগরসভ্যতার আমলে—সেই ব্যবিলন, মিশর ও সিন্ধুসভ্যতার যুগে। সে-সময়টায় আবার ছাতার ব্যবহার ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। যে-সে ব্যবহার করতেন না। একমাত্র রাজারাই ব্যবহার করতেন রাজছত্র। তবে বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নয়। সূর্যতাপ থেকে মাথা বাঁচাতে রাজার মাথার উপরে কেউ একজন ধরতো অতি সুদৃশ্য একটি ছাতা। বেশিরভাগ সময় রাজা যেতেন ঘোড়ায় টানা রথে করে। তখন সেই রথেই রাজার পেছনে থেকে কেউ ছাতা ধরতো, নতুবা রথের মাথায় ছাতা খাটাবার ব্যবস্থা করা হতো। রঙবেরঙের কাপড় দিয়ে তৈরি সুবৃহৎ ছাতার মাথায় থাকতো সোনার ছোট্ট একটা দেউল। কাপড়ের উপর সুন্দর করে থাকে থাকে বসানো হতো হীরে-মাণিক, আর তলায় থাকতো হীরে-মণি-মুক্তার ঝালর। বাপরে বাপ, সে কী ঘটা! অর্জুনের রথের ছবি দেখেছো তো ? ঠিক তেমনই।

সাধারণ মানুষ—যারা গ্রামে-গঞ্জে কাজ করে, যাদের খাটাখাটুনি করতে হয়, তাদের জন্য ছাতা নাকি চীনারা আবিষ্কার করেছেন বলে দাবি করে থাকেন। তাঁরা নাকি সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী

ছাতা খ্রীষ্টজন্মের একহাজার বছর আগে আবিষ্কার করেছিলেন এবং সে-ছাতা সূর্যতাপ থেকে মাথা বাঁচানোর জন্যেই। তবে কতটা সত্য, তা ঠিক করে বলার উপায় নেই।

সেকালে গ্রীকরা ছিলেন ভারি জ্ঞানী-গুণী। বড় বড় কারিগর জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেখানে। সেই প্রাচীনকালেও গ্রীকরা রাজ-তন্ত্রের বদলে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঐ কারণে সূর্যতাপে পথ হাঁটতে হলে গ্রীসে কেবল অভিজাতদের জন্য নয় সাধারণ মানুষের জন্যও ছাতা তৈরি হয়েছিল খ্রীষ্টজন্মের প্রায় পাঁচশ বছর আগে। গ্রীকদের পরে রোমান আমল ইওরোপের ইতিহাসে নানা-দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ রোমানরাই প্রথম বর্ষাকালে ছাতা ব্যবহারের রীতি প্রচলন করেন; অর্থাৎ ঐ সময় থেকে রোদে ও বর্ষায় উভয় ক্ষেত্রে ছাতা ব্যবহার হতে শুরু করে।

গবেষকরা ভারতীয়দের ছাতা ব্যবহারের কথা কিচ্ছুটি বলেননি। কিন্তু ছাতা ব্যবহারও ভারতের অতি সুপ্রাচীন ব্যবস্থা। রোমান আমলের ঢের আগে বর্ষার সময় ছাতা ব্যবহার করতেন ভারতীয়রা। সে-ছাতা তৈরি হতো তালপাতা, গোলপাতা কিংবা হোগলাপাতা দিয়ে। তবে সেসব ছাতা একই মাপের তৈরি হতো না। ছোট-বড় নানান আকারের করা হতো। এক একটিকে এত বড় করে তৈরি করা হতো যে, অবাধে বিশ-পঁচিশটা মানুষ বর্ষার সময় তার তলায় ঠাঁই নিতে পারতো। তালপাতার তৈরি ছোটবড় ছাতা আজও ভারতের বহু জায়গায় দেখা যায়।

গ্রীক ও রোমান আমলে ইওরোপে ছাতার ব্যাপক প্রচলন শুরু হলে কী হবে মধ্যযুগে ছাতার ব্যবহার একেবারে উঠে যায়। পুনরায় ছাতা ব্যবহারের সূত্রপাত করেন ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালীয়রা। সে-সময় পাশ্চাত্যে এসেছিল রেনাসাঁস বা নবজাগরণ। ছাতার উপযোগিতা অনেকেই উপলব্ধি করেন এবং দেখতে দেখতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাশ্চাত্যে ছাতা ব্যবহারের একেবারে হিড়িক পড়ে যায়।

লোহার শিকের কাঠামোর উপর কালো কাপড়ের আস্তরণযুক্ত যে ছাতা—তার জন্ম কিন্তু খুব বেশীদিনের নয়। লৌহশিল্পের উন্নতি হলে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই এর আবির্ভাব হয়েছে। এর পেছনেও আছে বহু কারিগর ও বহু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অবদান। তবে এও সত্য, কাপড়ের তৈরি সেদিনের ছাতাও ছিল অনেকটা আভিজাত্যের প্রতীক এবং ছাতার আভিজাত্য বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও পুরোদস্তুর বজায় ছিল। সেদিন খেতে-খামারে যাঁরা কাজ করতেন তাঁরা মাথায় তালপাতার তৈরি টোপর পরতেন। পথিকরা ব্যবহার করতেন ভারি তালপাতার ছাতা।

আজকে ছাতার সে আভিজাত্য নেই। প্রত্যেক মানুষই ব্যবহার করেন ছাতা। হালকা ও সহজে বহন করার জন্য এসেছে নানা কারিগরি। ভবিষ্যতে ওর ব্যবহার যে একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে—এমনও নয়।

মোজা

মোজার কথা বলতে গেলে জুতোর কথাও এসে পড়ে। পা-কে রক্ষা করতে এবং শীতের প্রকোপ থেকে শরীর বাঁচাতে জুতো ও মোজার জুড়ি নেই। পায়ের মাপের জুতো এবং চমৎকার করে পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত মোজায় ঢেকে ফেলা—প্রথম কোন শিল্পীর মাথায় যে এসেছিল, তা নিশ্চয়ই তোমাদের ভাবতে ইচ্ছে করে!

মানবসভ্যতার প্রগতির ক্ষেত্রে জুতো ও মোজার অবদানও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অতি ছোট্ট আবিষ্কার, কিন্তু তুচ্ছ নয়। আর এই আবিষ্কার দুটি মানবসভ্যতার একেবারে ঊষালগ্নেই বলা চলে। মানুষ যখনই পশুচর্ম পরিধান করতে শিখেছিল, তখনই শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত পশুর চামড়া দিয়ে ঘিরে ছিল। সেইদিনই সে বুঝতে পেরেছিল, পায়ের পাতাকে ঢেকে ফেললে অতি বড় শীতও কাবু করতে পারে না। তবে সেসময় জুতো ও মোজার পৃথক কোর অস্তিত্ব ছিল না।

মানুষ গুহা ছেড়ে যখন বেরিয়ে এসেছিল তখন শীতের প্রকোপ না থাকায় বন-জঙ্গলের কাঁটা, শক্ত পাথরের নুড়ি ইত্যাদি থেকে পা বাঁচাতে জুতোর পরিকল্পনা করেছিল। সহস্র সহস্র বছরের কারিগরদের প্রচেষ্টায় আজকের জুতো। কিন্তু প্রকৃত মোজা বলতে যা বোঝায়—তা অনেক পরের ঘটনা।

আদিকালের কথা বাদ দিলে বলতে হয় যে, মোজার ব্যবহার প্রথমে ফ্রান্সেই প্রচলিত হয়। সুতো, রেশম বা পশমের পরিবর্তে আগের মত চামড়া দিয়েই তৈরি হয়েছিল সেই মোজা। আর ব্যবহার করতেন ফ্রান্সের যত অভিজাত শ্রেণীর লোকরা। কারিগরি অবশ্যই ছিল, কিন্তু সুদৃশ্য বা সুরুচিসম্পন্ন ছিল না এবং অভিজাতরা ব্যবহার করতেন কেবল শীতকালেই।

ফ্রান্সের দেখাদেখি পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের মানুষও মোজার

প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। এর চাহিদা যখন বেড়ে উঠে, তখনই ওকে সুন্দর ও সুরুচিসম্পন্ন করতে সচেষ্ট হন কারিগররা এবং শীতকাল ছাড়াও অন্যান্য সময় যাতে ব্যবহার করা যায় তার জন্যও চেষ্টা চলতে থাকে। তখনই বুদ্ধি খরচ করে চামড়াকে পরিত্যাগ করা হয়। তৈরি হয় ভেলভেটের আস্তরণ দেওয়া সুতো, পশম বা সিল্কের মোজা। এবার সৌখিন ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা করলেন কী! মোজার উপর সরু ও পাতলা সোনার পাতের বিনুনি দিয়ে ঝকমকে করিয়ে আনলেন শিল্পীদের কাছ থেকে।

এ পর্যন্ত কোন মোজাই হাতে তৈরি করা হতো না। কাপড় কেটে এবং তাকে সেলাই করে মোজা তৈরি হতো। হাতে তৈরি মোজার প্রথম প্রচলন হয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে—ইংলণ্ডে। কথিত আছে, রাণী প্রথম এলিজাবেথকে কেউ একবার সিল্কের তৈরি একজোড়া হাতে বোনা মোজা উপহার দিয়েছিলেন। সেটি রাণীর এত পছন্দ হয়েছিল যে, সেই থেকে রাণী হাতে বোনা সিল্কের মোজাই পরতে শুরু করে দিলেন। আর রাণীর অনুকরণে ইংলণ্ডের তাবৎ যত নাম করা ব্যক্তি—সবাই শুরু করলেন ঐ সিল্কের মোজা পরতে।

সারা পৃথিবীতে হাতে বোনা সিল্কের মোজার প্রচলন শুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। বর্তমানে ওকে আরও সুরুচিসম্মত করা হয়েছে এবং সিল্কের পরিবর্তে কৃত্রিম তন্তুকেও ব্যবহার করা হচ্ছে।

দস্তানা

আমাদের দেশে দস্তানা একমাত্র শীতকালে কিছু কিছু বয়স্ক ছাড়া কেউ বড় একটা ব্যবহার করেন না। শীতপ্রধান দেশগুলিতে ওর ব্যবহার কিন্তু প্রচুর এবং সেই আদি থেকে সমানে ব্যবহার হয়ে আসছে। অর্থাৎ সেই গুহামানবরাই শীত থেকে রক্ষা পেতে হাতে দস্তানার মত পশুর চামড়া জড়িয়েছিল।

দস্তানার প্রকৃত উন্নতি হয়েছে গ্রীকদের আমলে। বিশেষকরে গ্রাক যোদ্ধারা দস্তানা ব্যবহার করতেন। গ্রীসের অভিজাত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও যে দস্তানা ব্যবহার করতেন তার প্রমাণও আছে হোমারের ওডেসি গ্রন্থে।

অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে শীতের দিনে আরাম আনতে জার্মানী, নরওয়ে ও সুইডেন চামড়ার তৈরি দস্তানা ব্যবহার করতো। পরের দিকে ঐ তিন দেশেই দস্তানার ব্যবহার ব্যাপক হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে দস্তানা ব্যবহারের রীতি ছড়িয়ে পড়ে পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশগুলিতে। আর তখনই চামড়ার পরিবর্তে দস্তানার জন্য লিনেনের ডাক পড়ে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে দস্তানা ব্যবহার একটা ফ্যাসানও হয়ে দাঁড়ায় এবং ঐ সময় থেকে মেয়েরাও শুরু করে দস্তানা পরতে। আর তখনই দস্তানাকে আরও চমৎকার ও আরও সুরুচিসম্পন্ন করার প্রচেষ্টা হয়। ঝকঝকে লিনেনের কাপড় দিয়ে মেয়েদের হাতের চেটো থেকে কনুই পর্যন্ত ঘিরে ফেলার যেমন ব্যবস্থা হলো তেমনই সোনার পাতকে যথাযথভাবে দস্তানার উপর স্থাপন করে ওর মূল্যকেও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য, মেয়েদের হাতের শোভাবর্ধনের জন্যই অনুরূপ দস্তানার প্রচলন হয়েছিল।

মহারাণী প্রথম এলিজাবেথের সময় থেকে মেয়েদের মধ্যে দস্তানা ব্যবহারের ফ্যাসান আরও বেড়ে ওঠে। এবার আরও উন্নতমানের

দস্তানা তৈরির যেন হিড়িক পড়ে যায়। নানা সূচের কাজ, সোনা ও রত্নপাথর যুক্ত করে দস্তানাকে কে কত সুন্দর করতে পারে—তার জন্য যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। এবং স্ত্রীলোকেরাও হাতে অলঙ্কারের পরিবর্তে কেবল দস্তানাই ব্যবহার করতে আরম্ভ করে দিলেন।

ফ্রান্সের লুই রাজবংশ ছিলেন ফ্যাসানের রাজা। সম্রাট চতুর্দশ লুইর নির্দেশে প্রচলন হয় "কিড গ্লাভস"। কিড গ্লাভস ছিল কেবল-মাত্র পুরুষদের জন্যই। আর মেয়েরা ব্যবহার করতেন রেশমী দস্তানা। সেসময় রেশমী দস্তানাকে পূর্বের চেয়েও অধিক অলঙ্কৃত করার ব্যবস্থা হয়েছিল। পরের দিকে মেয়েদের দস্তানায় অলঙ্কারের ঘটা ক্রমশঃ কমতে আরম্ভ করে।

ইট ও ঘরবাড়ি

তোমরা জানো, আজকের দিনেও পাকা ঘর তৈরির প্রধান উপকরণ ইট। যখন দেখ, রাজমিস্ত্রীরা লাল লাল ইটকে একের পর এক সাজিয়ে এবং মশলা দিয়ে গেঁথে বিরাট বিরাট বাড়ি বাড়ি খাড়া করেন তখন নিশ্চয়ই ভাবো মনে মনে, মানুষ ইটের পরিকল্পনাটা কবে করেছিল ?

ইটের পরিকল্পনা হাল আমলের নয়। ব্যাবিলন, মিশর, মহেঞ্জো-দড়ো প্রভৃতি যেসব জায়গায় খ্রীষ্টজন্মের তিন হাজার বছর আগেও সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, সেই সব জায়গায় ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রচুর পাকা ইট পাওয়া গেছে। তাই ইট আবিষ্কার আজকের নয়। খুব কম করে ধরলেও আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে তো বটেই। আরও আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে, সেসব ইট যেমন সুন্দর তেমনই মজবুত। গাঁথুনীও বেশ পাকা। সে আমলে তারা কেমন করে যে এমন চমৎকার নগর পরিকল্পনা করেছিল এবং এত যে পাকা ইট সুসজ্জিত করেছিল, তা ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়।

তবে একথা সত্য যে, মানুষের ইট কাটতে শেখা এবং ইট পোড়ানো একই সঙ্গে হয়ে উঠেনি। প্রথমে যেমন করে হোক তারা ইট কাটতে শিখেছিল এবং হয়ত আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে ওকে পুড়িয়ে পাকা ঘর তৈরির উপযোগী করেছিল।

মানুষ প্রথমে পাথর ও পরে বেশ কয়েক হাজার বছর কাদাকে নিয়ে কাটিয়েছে। ইট তৈরির আগে কাদামাটি থেকে মৃৎপাত্র তৈরি করেছিল। যখনই তারা নদীতীরে বসবাস স্থাপন করেছিল তখনই কাদামাটির পরিবর্তে ইটের আকারে কাদামাটিকে শুকিয়ে ঘর তৈরির পরিকল্পনা করেছিল। পরে তারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছিল, কাঁচা ইটের গায়ে জল পড়লে নষ্ট হয়ে যায়। তাই সেইসব ইটকে দৃঢ় ও মজবুত করতে বন থেকে কাঠ এনে ভালভাবে পুড়িয়েছিল।

নগরসভ্যতা পত্তনের সময় পর্যন্ত কিন্তু তারা কাঁচা ইটই ব্যবহার করতো। মাটিকে ভালভাবে তৈরি করতো এবং যাতে ফেটে না যায় তারজন্য বুদ্ধি করে খড়ের কুচিকে মেশাতো। এইভাবে হয়ত চলেছিল কতকাল। কেননা, মিশর প্রভৃতি জায়গায় যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাতে প্রথমের দিকে তারা কাঁচা ইটেরই বাড়ি করেছিল।

সেকালের ইট কিন্তু আজকের মত ছিল না। লম্বায় ও চওড়ায় আজকের ইটের চেয়ে কিছুটা বড় ছিল। তবে উচ্চতায় ছিল প্রায় অর্ধেক। আর সে কী শক্ত! সেই কবেকার—পাঁচ হাজার বছর আগেকার ইট, এখনও তেমনই মজবুত ও মসৃণ। অথচ তাদের পোড়ানো হতো কেবল কাঠ দিয়েই।

ইটের কথা শুনলে। এবার শোন ঘর-বাড়ীর কথা। তোমরা হয়ত ভাবছো, পাঁচ-হাজার বছর আগে মানুষ যখন পাকা ঘর বানাতে পেরেছে তবে তার আগে নিশ্চয়ই কাঁচা মাটির ঘর বানিয়েছিল!

কাঁচা ঘর অবশ্যই বানিয়েছিল তারা। কিন্তু ঘর তৈরির ইতিহাস খুব বেশিদিনের নয়; অর্থাৎ মানুষের ইতিহাস দীর্ঘ হলে কী হবে, সে সহসা ঘর বানাতে পারেনি। ঘর বানানোর পেছনে আছে সুদীর্ঘকালের চিন্তাভাবনা।

তাহলে আদিকালে মানুষ কোথায় বাস করতো?

সে অনেক কথা। গুহাবাসের আগে মানুষ বড় বড় গর্ত খুঁজে এবং সেই গর্তের ভেতরে শুকনো পাতা গাদা করে তারই উপরে শুয়ে রাত্রিযাপন করতো। আবার কেউ কেউবা গরিলা-শিম্পাঞ্জীদের মত গাছের ডালে রাত কাটাতো। যারা ছিল আরও বুদ্ধিমান—তারা গাছের ডালে শুকনো ঘাস ফেলে ছোট্ট একটা কুঁড়ের মত করে নিত।

এর পরের কাহিনী—মানুষের গুহাবাসের কাহিনী। প্রকৃতিদত্ত এই ঘরে মানুষ কাটিয়েছে কম করে ত্রিশ হাজার বছর। গুহাত্যাগ করার পর মানুষ যখন যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তখনই প্রকৃতপক্ষে ঘর বাঁধার প্রয়োজন অনুভব করে। যখন যেখানে থাকতো

তখনই গুহার অনুকরণে ঘর বানাতো। বাঁশ কিংবা গাছের ডালপালা পুঁতে তার উপর কাদার প্রলেপ দিত। ছাদটা করতো গম্বুজের মত। বৃষ্টিবাদলায় মাটি যাতে ধুয়ে না যায় তারজন্য ছাদের উপর পুরু করে শুকনো খড় পাতিয়ে দিত।

মানুষের ঘর-বাড়ীর উন্নতি হয় হ্রদ কিংবা নদীর বুকে যখন আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। আজ থেকে প্রায় হাজার দশেক বছর আগে মানুষ নিরাপদ ভেবে হ্রদ কিংবা নদীর মাঝখানে জলের উপর ঘর বানায়। সেগুলি কিন্তু ভারি চমৎকার ছিল। বন থেকে কাঠ কেটে এনে চার-পাশে অনেকগুলো লম্বা লম্বা খুঁটি পুঁততো। খুঁটির উপরে লম্বালম্বি-ভাবে সরু সরু কাঠ ফেলে একটা ছাদের মত করতো জল থেকে কিছু উপরে। ছাউনি দিত সেই শুকনো তৃণের। ঘরগুলো দোতালা এবং তিনতলাও করতো।

মাটি দিয়ে কিংবা কাঁচা ইট দিয়ে ঘর বানাতে শুরু করে হয়ত খ্রীষ্টজন্মের চার হাজার বছর আগে। আর সেই থেকে ঘর তৈরির ব্যাপারে অভাবনীয়ভাবে উন্নতি হতে থাকে। পাকা ইট, চৌকো পাথর ইত্যাদিও আর বাদ গেল না। মজবুত ও সুদৃশ্য করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করলো। অতঃপর সভ্যদেশগুলিতে রাজপদ সৃষ্টি হলে এবং ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন হলে গগনচুম্বী দর্শনীয় সব অট্টালিকা তৈরি হতে থাকে এবং অট্টালিকা তৈরির জন্য দস্তুরমত গবেষণাও শুরু হয়। অট্টালিকা তৈরির মূলনীতি কড়ি, বরগা ও খিলান—এগুলি সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেরই আবিষ্কার।

প্যাপিরাস

তোমরা কোনকিছুকে লিখতে গেলে কাগজের সাহায্য নাও। লিখতে গিয়ে কী তোমাদের মনে পড়ে না, এই কাগজ প্রথমে কে বা কারা তৈরি করেছিল? কোন দেশই বা তৈরি করেছিল এবং এর আদিরূপটাই বা কেমন ছিল?

আজকের কাগজ-যন্ত্রের সাহায্যে কাঠ, বাঁশ প্রভৃতির মণ্ড থেকে রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত করা হয়। হাতে তৈরি কাগজও আছে। আর এই হাতে তৈরি কাগজ প্রথম চীনারাই তৈরি করেছিলেন।

এমন একদিন ছিল যেদিন মানুষ তার মনের ভাবকে লিপিবদ্ধ করার উপকরণ খুঁজে পেতো না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাটির ফলকে লিখে পুড়িয়ে ফেলতো। কথিত আছে, চীনা পণ্ডিতেরা লেখার জন্য কচ্ছপের খোল ব্যবহার করতেন।

খ্রীষ্টজন্মের প্রায় দু-হাজার বছর আগে লিখে রাখার যে সরঞ্জামটি আবিষ্কৃত হয়েছিল—তার নাম প্যাপিরাস। এটি আবিষ্কার করেছিল প্রাচীন মিশর এবং এইটিই কাগজের আদিরূপ।

প্যাপিরাস হচ্ছে নলখাগড়া জাতীয় একধরণের উদ্ভিদ। অত্যন্ত নরম এই উদ্ভিদটি প্রায় তিন মিটার পর্যন্ত উঁচু হতো। গোড়াটা হাতের কব্জির মত মোটা হতো কিন্তু উপরের দিকটা ক্রমশঃ সরু এবং শাখা-প্রশাখাযুক্ত। পাতা খুব ছোট এবং মূল ভয়ানক শক্ত।

প্রখ্যাত রোমান পণ্ডিত প্লিনির বর্ণনা থেকে জানা যায়, প্যাপিরাস গাছের মোটা অংশটার ফালি কেটে ফালি থেকে ছাল ছাড়িয়ে ছালটাকে পৃথক করে নিতো মিশরীয়রা। তারপর ঐ ছালের ফালি-গুলোকে একটার সঙ্গে আর একটা আঠা দিয়ে জুড়ে জুড়ে বিরাট লম্বা করতো। লম্বাই ও চওড়ায় এক একটা প্রায় চাদরের মত করে তাকে গোল করে গুটিয়ে ফেলার ব্যবস্থা ছিল। লেখার ক্ষেত্রে এবং ছবি আঁকার খুব সুবিধা হতো এতে।

প্রাচীন মিশরের ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুরূপ লেখার উপকরণ প্রচুর পরিমাণে উদ্ধার করা হয়েছে। সেকালে মিশরীয়দের ইতিহাস, জীবনযাত্রা প্রণালী, কী কী জিনিস মিশরীয়রা আবিষ্কার করেছিল, ইত্যাদি নানা তথ্য লাভ করা গেছে প্যাপিরাসের উপর আঁকা ছবি ও লেখা থেকে।

একসময় ভারতীয়রা লিখতেন ভোজগাছের পাতায় ও ছালে। ভোজগাছের ছাল কিন্তু অনেকটা পাতলা কাগজের মত। এছাড়াও ভারতীয়রা লেখার কাজে তালপাতা ব্যবহার করতেন। তালপাতাগুলোকে কেটে প্রথমে শুকিয়ে নেওয়া হতো। যাতে সহসা ফেটে না যায় তারজন্য বেশ কিছুদিন জলে ফেলে রাখা হতো। তারপর সূতো দিয়ে গেঁথে ফেলা হতো পাতাগুলোকে। এখনও এই ধরণের অনেক পুঁথি বিভিন্ন সংগ্রহশালায় চোখে পড়ে।



রেশমী কাপড় তোমাদের নিশ্চয়ই পছন্দ! ওর ঝকঝকে সোনালি রঙটা তোমাদের মনটাকে কী কেড়ে নেয় না? ভাবতে ইচ্ছে হয় না কী কে, কেমন করে ওকে আবিষ্কার করেছিল?

রেশমের আবিষ্কারের কথা আলোচনার আগে রেশমটা কোথা থেকে পাওয়া যায়, সেসম্বন্ধে একটু বলে নেওয়া যাক। তোমরা বোধ হয় অনেকেই জানো, সুচিক্কন ঐ রেশমী সূতোটা গুটিপোকারই অবদান। একধরণের প্রজাপতি—যাকে বলা হয় মথ, ওরা গাছের পাতায় ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে শূক বেরোয়, অবশেষে শূকরা পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠলে নিজের চারপাশে লালা দিয়ে একটা গুটি বানিয়ে নিয়ে আত্মগোপন করে থাকে। কিছুদিন এইভাবে কাটানোর পর নানা রূপান্তরের ভেতর দিয়ে একদিন প্রজাপতিতে পরিণত হয় এবং তখনই গুটি কেটে বেরিয়ে আসে।

ঐ গুটি থেকেই রেশম হয়। আর রেশম পেতে হলে গুটি কেটে প্রজাপতি বেরিয়ে আসার আগে গুটিটাকে গরম জলে সেদ্ধ করে নিতে হয় এবং তখনই সুবিধে হয় রেশম সংগ্রহ করতে।

দামী ঐ রেশমীসূতোকে সংগ্রহ করতে বর্তমানে গুটিপোকার চাষ করা হয়। তবে আগে মানুষ যখন রেশমের কথা আদৌ জানতো না, তখন কিন্তু প্রকৃতির বুকে মথরা এসেছিল। তারা বনে জঙ্গলে যেসব গাছের পাতাকে শূকরা খেতে ভালবাসে—সেইসব গাছের পাতায় ওরা ডিম পাড়তো এবং এখানে সেখানে, বনে-বাদাড়ে প্রচুর গুটি পাওয়া যেতো। মানুষ তখন ওদের কাজে লাগাতে শেখেনিতো, তাই।

মানুষ তাহলে ওদের কবে কাজে লাগাতে শিখলো?

সে অনেক—অনেক আগেকার কথা! খ্রীষ্টজন্মের প্রায় দু-হাজার বছর আগের কাহিনী। তখন চীনদেশটা শাসন করতেন এক রাণী।

নাম তাঁর—সি লিং সী। রাণী খুব সৌখিন ছিলেন এবং বয়সে ছিলেন তরুণী। আর হয়ত কম বয়সের জন্য অজানাকে জানার আগ্রহ ছিল তাঁর অপরিসীম।

একবার হয়েছে কী! বাগানে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ে অনেকটা ডিমের আকারের চমৎকার একটা গুটি। গুটিটা কেটে তখনও প্রজাপতি বেরিয়ে যেতে পারেনি, আর এমন গুটি কোনদিন তাঁর চোখেও পড়েনি। তাই কৌতূহলী হয়ে বাড়িতেই বহে নিয়ে এলেন।

রাণী তাঁর বসার ঘরে গুটিটাকে হাতে নেড়ে নেড়ে দেখছিলেন। একসময় এক পরিচারিকা এসে তাঁর হাত ধোওয়ার জন্য রেখে যায় একবাটি গরম জল। রাণী আনমনে বোধ হয় ঐ গুটিটার কথাই চিন্তা করছিলেন। অকস্মাৎ হাত ফস্কে পড়ে যায় গুটিটা। আর পড়বি তো পড়—এক্কেবারে সেই গরমজলের বাটিতেই।

রাণী কিন্তু গুটিটাকে সহজে ছেড়ে দিলেন না। একসময় নিজেই তুলে আনলেন গরম জল থেকে। গুটিটা নরম মনে হওয়ায় তিনি এবার একটু চাপ দিলেন গুটির উপরে। আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, অতি সরু—এক্কেবারে সোনার মত চিক্কন একধরণের সুতো বেরিয়ে এলো। তিনি আরও চাপ দিলেন এবং নখ দিয়ে একটু আঁচড়ালেন। এবার বেরিয়ে এলো আরও অনেক সূতো।

সূতো দেখে রাণী তো অবাক! সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় এসে গেল, এই সূতো দিয়ে কাপড় বুনতে পারলে খুব চমৎকারই হবে!

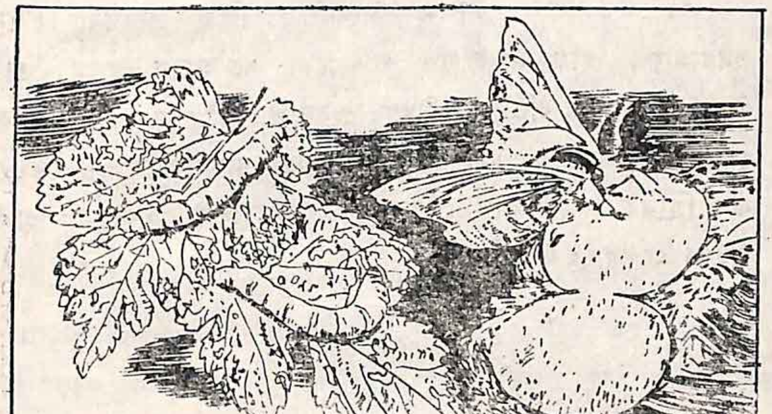
রাণীর আদেশে লোকজন লেগে গেল বনবাদাড় থেকে গুটি সংগ্রহ করতে। রাণীর জন্য একটা কাপড়ও তৈরি হলো। কাপড় দেখে রাণী হলেন বেজায় খুশি।

চীনারা ছিলেন বুদ্ধিমান। সূতোর বৈশিষ্ট্য দেখে তারা গুটি-পোকার চাষই শুরু করে দিল এবং প্রচুর কাপড় তৈরি করে বিদেশে পাঠালো বিক্রি করার জন্য। কিন্তু রেশম তৈরির পদ্ধতিটা এক্কেবারে চেপে গেল।

রেশমী কাপড়—তার গুণের জন্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুনাম অর্জন করছিল এবং বিদেশের বাজারগুলিতে একরকম কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। শ' শ' বছর রেশম তৈরির পদ্ধতি গোপন রেখে চীনারা একরকম চুটিয়ে ব্যবসা করে নিয়েছিল বলা যেতে পারে।

পদ্ধতিটি গোপন রাখতে তারা যথেষ্ট সাবধানতাও অবলম্বন করেছিল। কোন বিদেশী ব্যবসায়ীকে তাদের দেশে ঢুকতে দিত না। সবাইকে কিনে নিয়ে যেতে হতো সীমান্ত অঞ্চলের বাজারগুলি থেকে। সেখানেও ছিল যথেষ্ট কড়াকড়ি।

বিদেশীরাও ছাড়বার পাত্র ছিল না। তারাও গোপনে গোপনে অনুসন্ধান চালাতে লাগলো, কেমন করে চীন ঐ রেশমী সূতোটা তৈরি করে?



চীনাদের সতর্কতার কাছে প্রায় দু-হাজার বছর কাল হার মেনেছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমূহ কৌশল। শেষে ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কোনরকম জানতে পারে এবং সেও তথ্য গোপন রেখে ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকে।

পাশ্চাত্যের বাজারে রেশমী কাপড়ের তখন ভয়ানক চাহিদা। এক একটা কাপড় প্রচুর দামে বিক্রি হচ্ছে। রাজ-রাজড়া ও অভিজাতদের রেশমের কাপড় না হলে চলে না, অথচ চাহিদা অনুযায়ী কেনাও যায় না। একেবারে ভাবিয়ে তুললো পাশ্চাত্যকে।

অবশেষে চীনাদের গোপন তথ্য ফাঁস করতে প্রয়াসী হলেন বাইজেনটাইন রাজ্যের খ্যাতনামা সম্রাট জাষ্টিনিয়ান। তিনি করলেন কী, পারস্য থেকে কয়েকজন গুপ্তচরকে ভালভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে সন্ন্যাসীর বেশে প্রেরণ করলেন চীনে। চীনারা কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাসী ভেবে নিয়ে ওদের সাদরে গ্রহণ করলেন এবং সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করারও আদেশ দিলেন। আর সেই সন্ন্যাসীরা করলেন কী? কিছুকাল চীনে কাটিয়ে যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন বাঁশের চোঙার ভেতরে কয়েকটা গুটিকে লুকিয়ে লাঠির মত করে হাতে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে চলে এলেন। চীনারা আদৌ সন্দেহ করতে পারলেন না। বলা বাহুল্য, তাঁরা রেশম তৈরি ও গুটিপোকা চাষের কথাটা জেনে এসেছিলেন।

এর পর আর গোপন থাকেনি। কিন্তু ভারতবর্ষ চীনের সমসাময়িক কালে না হলেও পাশ্চাত্যের বহু আগে রেশম তৈরির উপায় উদ্ভাবন করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর দিকেও যে ভারত রেশমী-বস্ত্র উৎপাদন করতো এবং রোমের বাজারে যে পাঠাতো, সে কথা প্লিনিই উল্লেখ করে গেছেন। কিন্তু বিদেশী গবেষকরা ভারত সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন।

ঘরের শোভা আসবাবপত্র। যাঁর যেমন ক্ষমতা তিনি সেইভাবেই নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলোকে গোছগাছ করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখেন। তার জন্য কাঠ ও লোহার রকমারি আসবাব থাকে। তাছাড়া বসার জন্য চেয়ার, টেবিল, টুল ; ঘুমোনোর জন্য খাট, বিছানা; জিনিসপত্রকে ঠিকমত রাখতে বাক্স, আলমারি প্রভৃতি কত হরেক্ রকমের জিনিসের না প্রয়োজন হয়ে থাকে ? ভেবে দেখেছো কী, বসা ও শোওয়ায় আরাম আনতে, ঘরকে পরিপাটি করে সাজাতে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রকে সাবধানে রাখতে মানুষ এদের কবে পরিকল্পনা করেছিল ?

বুঝতেই পারছো, এগুলো ঘরের পক্ষেই সম্ভব। যতদিন মানুষের ঘর ছিল না, ততদিন কোন আসবাবও ছিল না। গুহাবাসের সময় থেকেই সে আসবাবপত্রের চাহিদা অনুভব করে।

যতদিন গুহায় কাল কাটিয়েছিল, ততদিন আসবাবের বিশেষ বালাই ছিল না। তাছাড়া সেদিনের মানুষের বিশেষ চাহিদা না থাকায় আসবাবের প্রয়োজনও অনুভব করেনি। সম্পদ বলতে ছিল পাথরের কতকগুলো ভোঁতা হাতিয়ার। সেগুলোর কিছু কিছু গুহায় রাখতো, নয়ত গাছের কোটরে। ছোট ছোট হাতিয়ারগুলোকে রাখতো চামড়ায় জড়িয়ে। ঘুমাতো মেঝেতে চামড়া পেতে। খাদ্যকে দুর্দিনের জন্য মজুত করে রাখার মানসিকতাও ছিল না সেদিন।

প্রকৃতপক্ষে আসবাবের পরিকল্পনা হয় প্রাচীন নগরসভ্যতাগুলোর বিকাশ ঘটলে। সেদিন মানুষের মধ্যে বৈষম্যও সৃষ্টি হয়েছিল। তাই যারা ধনবান হয়ে উঠেছিল তারা বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিল। তৈরি হতে শুরু করে কাঠ অথবা হাতীর দাঁতের খাট, চেয়ার, টেবিল, বাক্স, টুল ইত্যাদি ; অর্থাৎ আজকের সাধারণ আসবাবপত্রের প্রায় সমূহই আবিষ্কৃত হয়েছিল সেই নগরসভ্যতার যুগে—

খ্রীষ্টজন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে।

আসবাবপত্র নির্মাণে প্রাচীন মিশরই মনে হয় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। পিরামিডের ভেতর থেকে প্রাচীন মিশরীয় রাজাদের ব্যবহৃত যেসব আসবাবপত্র পাওয়া গেছে তা দেখলে চোখ ফেরাতে পারা যায় না।

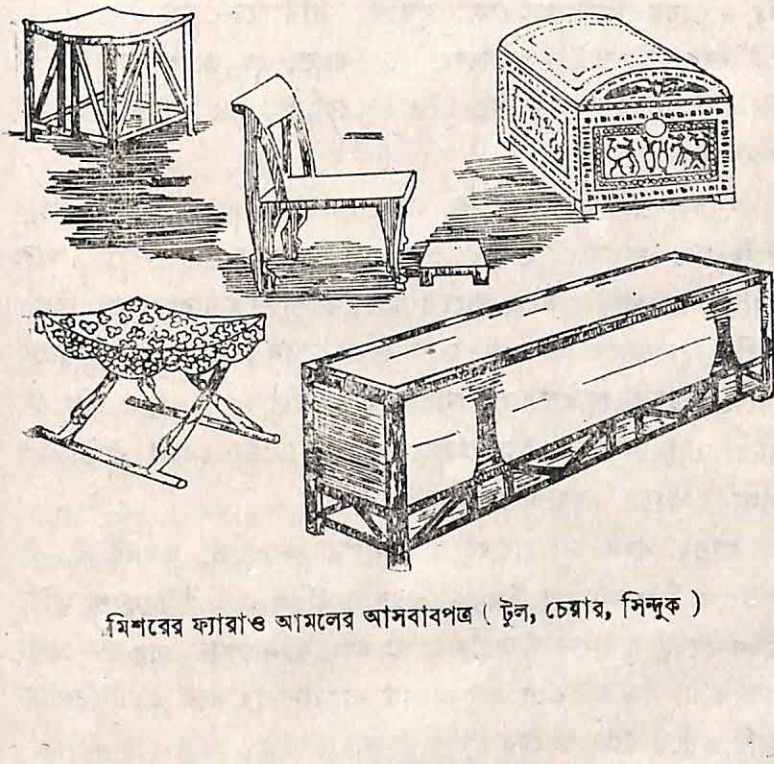
সেকালে মিশরীয় রাজা বা ফ্যারাওরা বেশ বিলাসীই ছিলেন। তাঁরা নানা ধরনের আসবাবপত্র ব্যবহার করতেন ঠিকই, কিন্তু বিছানার ক্ষেত্রে কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। অবশ্য খাটটাকে নানা-ভাবে সাজাতেন, সোনা এবং মূল্যবান পাথর সংযুক্ত করতেন, কিংবা পুরো খাটটাই তৈরি হতো হাতীর দাঁত বা সোনা বা ব্রোঞ্জ দিয়ে। কিন্তু সেই খাটে না ছিল বালিশ, না ছিল গদি বা তোষক। কেবল খাটের উপর পাতিয়ে রাখতো এক বা একাধিক পশুর চামড়াকে। ব্যাপারটা সোনার কৌটার ভেতরে ইটপাটকেলকে পুরে রাখার মত, আর কী!

বিছানার উন্নতি বুদ্ধিমান গ্রীকরাও করতে পারেননি। এমনকি পরবর্তীকালে অত্যধিক বিলাসী রোমান আমলও গেছে সোনার খাটের উপর পশুর চামড়া পাতিয়ে পাতিয়ে। বালিশের উপর মাথা দিয়ে ঘুমোনো বা বিছানাকে নরম করার কোন পদ্ধতিই তারা আবিষ্কার করতে পারেনি।

বিছানার উন্নতি হয়েছে মধ্যযুগে। বিলাসী ব্যক্তিরা ঐ সময় থেকে খাটের উপর কার্পেট পাততে শুরু করে। তারপর শুধু কার্পেটেই তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারল না। আরও নরম ও মোলায়েম করতে কার্পেটের তলায় পুরু করে উল, পাখীর পালক কিংবা চুল পাতার ব্যবস্থা করলো। গদি বলতে যা বোঝায়, তা তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। এটি আবিষ্কার হয়েছে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।

আসবাবপত্র ব্যবহারের ব্যাপারে ভারতবর্ষ কেমন যেন নিস্পৃহই ছিল। ভারত দার্শনিকের দেশ। তার জীবনদর্শন ছিল সর্বপ্রকারের ভোগবিলাস বর্জন এবং কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে শুভফল অর্জন করা। তাই

আর্য-ঋষিদের আমল থেকে বসা, শোওয়া ইত্যাদির জন্য পাথরের বেদিই ছিল উপযুক্ত। তক্ষশিলা, নালন্দা প্রভৃতি প্রাচীনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, সেকালে ছাত্ররা চেয়ার টেবিল ব্যবহার করতেন না। পাথরের বেদির উপর কুশাসনে সোজা হয়ে বসে ছাত্ররা পড়াশোনা করতেন। কেবল বইকে সামনে পেতে ধরার জন্য কাঠের তৈরি একটা বিশেষ আসন প্রচলিত ছিল। নাম ছিল ব্যাসাসন। এটিকে এখনও দেখা যায় কোথাও কোথাও।



মিশরের ফ্যারাও আমলের আসবাবপত্র (টুল, চেয়ার, সিন্দুক)

সূচ

আজকের দিনে সূচ থাকে না—এমন একটি ঘরও বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানুষের পোশাক-আশাক বুনতে, সেলাই করতে, পোশাক ছিঁড়ে গেলে তাকে একটু রিপু করতে সূচ ছাড়া উপায় নেই। অতি সাধারণ জিনিস, তবু তার কারিগরিটিকে অসাধারণ বলা চলে। আর ওর যত কারিগরি—সবই ঐ ছাঁদাটিকে ঘিরে। সত্য কথা বলতে কী, মানুষের পোশাকের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিয়েছে ছোট্ট ঐ সূচই।

এবার নিশ্চয়ই তোমাদের মনে হচ্ছে, এই অতি প্রয়োজনীয় জিনিসটি প্রথম কেমন করে তৈরি হয়েছিল এবং তৈরি হয়েছিল কতকাল আগে ?

সূচের পরিকল্পনাটা কিন্তু আজকের নয়। এর আবিষ্কর্তা মধ্য-প্রস্তরযুগের মানুষ। তারাই প্রথম পশুর চামড়াকে সেলাই করে পরতে গিয়ে পাখীর হাড়, মাছের কাঁটা, প্রভৃতিকে ব্যবহার করেছিল। আদিম সূচ বলতে এরাই। তবে এদের কোন ছিদ্র না থাকায় সূচের বদলে কাঁটা বলাই বোধ হয় অধিক যুক্তিসঙ্গত হবে। মনে হয় সে সময় মানুষ কোন কোন ক্ষেত্রে গাছের মোটা মোটা কাঁটাকেও সেলাইর কাজে ব্যবহার করতো।

মানুষ যখন নব্যপ্রস্তরযুগে পদার্পন করেছিল, তখনই ঐ সব কাঁটাকে ছিদ্র করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। এই উদ্দেশ্যে তারা গ্রহণ করেছিল পশুর পাঁজরার হাড় এবং কোন কোন পশুর ছুঁচলো দাঁতকে। বড় কষ্ট করে এবং অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে একটা সূচকে তৈরি করতে হতো তাদের।

প্রস্তরযুগের পরে মানুষ যখন ব্রোঞ্জযুগে পা দেয় তখন সূচ তৈরি অনেকটা সহজ হয়ে উঠে। হাড়, দাঁত ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে ব্রোঞ্জ দিয়ে সূচ বানাতে চেষ্টা করে। এর নমুনা পাওয়া গেছে প্রাচীন সভ্যতাগুলোর ধ্বংসাবশেষ থেকে। দেখা গেছে, এগুলোর কোনটিই

আজকের সূচের মত এতটা সুন্দর নয়। আকারে ছিল বেশ বড়সড়, মাথাটা তুলনামূলকভাবে অনেক মোটা এবং অগ্রভাগ বেশ ভোঁতাও বটে। সূক্ষ্মভাবে কোনকিছুকে সেলাই করার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল। তবু এই ধরনের সূচ প্রচলিত ছিল দীর্ঘকাল। এমনকি লোহা আবিষ্কারের পরেও লোহা দিয়ে সূচ তৈরির কথাটা কারও মনেই আসেনি। অবশ্য সে সময় লোহাকে নিষ্কাশন করা সহজ ছিল না। এবং যতটুকু নিষ্কাশন করতো তা কেবল অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতেই ব্যয় হয়ে যেতো। সূচের মত এমন একটা নগণ্য জিনিসের জন্য লোহাকে ব্যয় করতে প্রবৃত্তিই হতো না তাদের।

আজকের দিনে ছুঁচলো অগ্রভাগ বিশিষ্ট সরু সরু যে সব লোহার সূচ দেখি, ওদের আবিষ্কর্তা নাকি চীনারা। কথিত আছে, মধ্যযুগে মুররা চীনে গিয়ে সেখানকার সূচ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। স্পেনে ফিরে আসার সময় নিয়ে এসেছিলেন বেশ কিছু সূচকে।

মুররা ছিলেন আরবের লোক। ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য তাঁরা বহু জায়গা চষে ফেলেছিলেন যেন। স্পেনে গিয়ে সাম্রাজ্যও স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের কাছে সূচ দেখে পাশ্চাত্যের বহুদেশ সূচ তৈরি করতে উৎসাহী হয়। শেষে চীনের অনুকরণে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে জার্মানীর নুরেমবার্গে প্রথম সূচ তৈরি হতে শুরু করে। ঐ সূচ যথেষ্ট উন্নত মানের হওয়ার জন্য পাশ্চাত্যে জার্মান বেশ চুটিয়ে ব্যবসা করেছিল এবং যথেষ্ট পয়সাও রোজগার করেছিল।

পাশ্চাত্যে জার্মানদের পরে সূচ তৈরি করে ইংরাজরা। তখন মহারাণী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকাল। মহারাণীর আগ্রহে জার্মান থেকেই নিয়ে আসা হয়েছিল একজন সূচ প্রস্তুতকারককে। আর ঐ কারিগরটির কাছ থেকে ইংরাজরা আয়ত্ত করে নিয়েছিল সূচ তৈরির কৌশলটা এবং তারাও জুড়ে দিয়েছিল সূচের ব্যবসা।

এর পর ধীরে ধীরে অন্যান্য দেশ সূচ তৈরি করতে শুরু করে। আর তখনই সূচের চাহিদা ধীরে ধীরে কমে আসে এবং দামেও হয় সস্তা। আগের কৌলিন্য হারিয়ে সূচ এবার অতি সাধারণ একটা জিনিসে রূপান্তরিত হয়।

পিন

আমাদের অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির মধ্যে পিনও নিঃসন্দেহে অন্যতম। অতি ছোট এবং অতি নগণ্য এর মূল্য। আলপিন, সেফটিপিন প্রভৃতির আকারে ধনীর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের কুঁড়েঘর পর্যন্ত সর্বত্রই ওর কদর। তোমাদের হাতের কাছেও হয়ত সবসময় দু-দশটা মজুত থাকে।

কেবল আজকের দিনে নয়, অতি প্রাচীনকালেও মানুষের প্রয়োজন হতো পিনের মত জিনিসের। অর্থাৎ যখন মানুষের সঙ্গে কোন ধাতুর পরিচয় হয়নি এবং ঘর-গৃহস্থালীর জিনিসপত্রের এত ঘটা ছিল না, তখনও মানুষ তার পরনের পশুচর্মকে আঁটসাঁট ভাবে জড়িয়ে রাখতে ছুঁচলো অগ্রভাগবিশিষ্ট মাছের কাঁটা, গাছের কাঁটা বা পশুর ছুঁচলো হাড়কে ব্যবহার করতো। “পিন” শব্দটির প্রকৃত অর্থও হচ্ছে কাঁটা। এটি এসেছে ল্যাটিন “স্পিনা” নামক শব্দটি থেকে এবং এই স্পিনা অর্থে কাঁটাকেই বোঝায়। তাই কথাটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে তার পূর্বরূপ।

সূচের মত পিনও তার আদিরূপ পরিবর্তন করে ব্রোঞ্জযুগে। ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি সেদিনের পিন ছিল সেফটিপিন জাতীয়। এর একমাত্র কাজ ছিল, গায়ের পোশাক-পরিচ্ছদকে ঠিকমত আটকে রাখা। আর ঐ কারণে ওকে মেয়েরাই বেশী ব্যবহার করতো।

পিনের ব্যবহারটা পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যেই অধিক প্রচলন হয়। আগে একমাত্র গায়ের কাপড়চোপড়কে ঠিক রাখতে ব্যবহার করা হতো, এবার ডাক পড়ে নানাধরনের সাজসজ্জার ক্ষেত্রে। কোন কিছুকে গেঁথে রাখতে আলপিনেরও হয় প্রচলন। তবে সেফটিপিনেরই চাহিদা ছিল বেশী। পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে সেফটিপিনের চাহিদা এত বেড়ে উঠেছিল যে, পিন প্রস্তুতি দস্তুরমত একটা বড় শিল্প হিসাবে সমাদর লাভ করেছিল। মূল্যও ছিল খুব বেশী। এত বেশী যে,

সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে ছিল বলা যায়। অর্থাৎ সেদিনের পিন আজকের মত এমন অচ্ছুৎ ছিল না।

পিন সহজলভ্যও ছিল না সেদিন। কখনও কখনও পিনের পরিবর্তে সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হতো। ঐ কারণে ইংরেজীতে "পিন মানি" নামে একটি প্রবচনের প্রচলন হয়েছিল। মেয়েরা পিন অধিক ব্যবহার করতেন বলে প্রবচনটির প্রকৃত অর্থ "মেয়েদের পোশাক-আশাকের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্য।" সেদিন অভিজাতরা আবার কাউকে নববর্ষের উপহার দিতে গেলে পিনই উপহার দিতেন। প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পিনের এই কৌলিন্য বজায় ছিল এবং সোনার চেয়েও দামী ছিল।

অল্পমূল্যে পিন তৈরির প্রচেষ্টা প্রথম ফ্রান্সই শুরু করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তারা পিন তৈরির সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করে পিনের পূর্ব-মর্যাদাকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। আজ আজকের যান্ত্রিক সরঞ্জামের মাধ্যমে ঘণ্টায় সহস্র সহস্র আলপিন তৈরি করতেও কোন অসুবিধা হয় না।

ঝাঁটা

তোমরা জানো, ঘরদোরকে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করতে, নোংরা ও আবর্জনাকে দূরে সরাতে, ঝাঁটার তুল্য কেউ নয়। ঝাঁটা যদি আবিষ্কার না হতো, তাহলে মানুষের আবাসের সঙ্গে বনের জন্তু-জানোয়ারের আবাসের কোন তফাৎ থাকতো না। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে, মানবসভ্যতার ইতিহাসে ঝাঁটার গুরুত্ব কতখানি। সহস্র সহস্র উন্নত আবিষ্কারের কাছে ঝাঁটার আবিষ্কার নিতান্ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মত মনে হলে কী হবে এর বিহনে মানব-সভ্যতা সেই বনেই থেকে যেতো।

সভ্য মানুষের নিত্যসঙ্গী ঐ ঝাঁটার কাহিনীও তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে? তাহলে শোন সেই কাহিনী।

ঝাঁটার প্রচলন মানুষের গুহাবাসের একেবারে শেষের দিকের ঘটনা। তার আগে মানুষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে জানতো না। না নিজের শরীরের, না গুহার। জলকে ছিল বেজায় ভয়, তাই স্নানও করতো না কেউ। পচামাংসে অরুচি না থাকায় এবং চামড়া, হাড় ইত্যাদিকে সংরক্ষণ করতে হওয়ায় বাসস্থানের দুর্গন্ধে বনের পশুও বুঝি পালাতো এবং গায়ের গন্ধে ভূতও ভয়ে ভিড়তো না। ঝাঁটা নোংরা আবর্জনাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতেই মানুষ মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে।

ঝাঁটার কথা কী সহজে স্থান পেয়েছিল মানুষের মাথায়! প্রথম প্রথম করতো কী, একটা গুহা আবর্জনায় ভরে উঠলে অন্য গুহায় চলে যেতো। কিন্তু বংশবিস্তারের ফলে হাজার হাজার বছর পরে গুহাগুলো যখন মানুষে মানুষে ছেয়ে গেল এবং নতুন নতুন গুহার সন্ধান পাওয়া গেল না তখন গুহা থেকে আবর্জনাকে সরাবার চিন্তা মাথায় এলো। আর ঐ আবর্জনাকে সরাতে গিয়েই গুহাকে পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল। তখনই একগোছা গাছের সরু সরু

ডালকে বা বাঁশের কঞ্চিকে একসঙ্গে বেঁধে কতকটা ঝাঁটার মত করে কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছিল গুহা ও উঠান পরিষ্কার করতে।

গুহাবাসের এক্কেবারে শেষের দিকের ব্যাপার তো! তাই কিছুটা শৌখিনও হয়ে পড়েছিল মানুষ। কাঁচা মাংস খেতো না, গুহার ভেতরে মৃতদেহকে কবর দিত না এবং নানা ধরনের মাটির পাত্রও তৈরি করতে পেরেছিল। তাছাড়া পরিধেয় পশুচর্মেও অনেক রূপান্তর এনেছিল। ঐ সব কারণে দরকার হয়ে পড়েছিল জিনিসপত্রকে ঝাড়-পোঁছ করার। ঐ কাজটার জন্য তারা লাঠির ডগায় একগোছা লম্বা লম্বা পশুর লোমকে ঝাড়নের আকারে বেঁধে নিতো।

গুহা থেকে বনে এবং পরে বন থেকে বেরিয়ে যখন নগর পত্তন করেছিল মানুষ, তখন পশুর লোম আর সহজে পাওয়া গেল না। অপরদিকে ডালপালাকে নিতান্ত আনাড়ীর মত বেঁধে নিয়ে ঘর-দোরকে সাফ করতে রুচিতেও বাধলো। তখন করেছিল কী? শর জাতীয় গাছের লম্বা লম্বা ও শক্ত পাতাকে লাঠির ডগায় আট-সাঁট করে বেঁধে ঘরদোর পরিষ্কার করতে শুরু করলো। কথিত আছে, এইভাবে তৈরি ঝাঁটা দিয়ে তারা কেবল ঘর ও উঠান ঝাঁট দিত না, রাস্তাঘাটকেও পরিষ্কার করতো।

অনুরূপ ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধরেই চলে এসেছিল। মনে হয় প্রথম ভারতীয়রাই শিল্পসম্মতভাবে ঝাঁটা তৈরি করেছিল। নানা ধরণের তৃণ, খেজুরপাতা, নারকেল পাতার পিছ, পাখীর পালক এবং কাশ জাতীয় তৃণের পুষ্পদণ্ড দিয়ে অতি সুন্দর সুন্দর ঝাঁটা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। এটিকে একটি শিল্প হিসাবেও গ্রহণ করেছিলেন অনেকে। কিন্তু ভারত ছাড়া বিদেশের বাজারে ওর অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবেশলাভ ঘটেনি।

কেবল ভারত নয়, কোন কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিল্পীও সুন্দর সুন্দর ঝাঁটা বাঁধতে পারতেন। আর ওঁদেরই কাছ থেকে পাশ্চাত্য প্রথম ঝাঁটা তৈরি রপ্ত করে। এ সম্বন্ধে একটি কাহিনীও প্রচলিত। আমেরিকার প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিজ্ঞানী

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রথম তাঁর এক রেড ইণ্ডিয়ান বন্ধুর কাছে দেখেন একটি অতি উন্নত মানের তৃণের ঝাঁটা। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন খুব খুশি হন এবং তাঁরই প্ররোচনায় বাহির থেকে সেই তৃণকে সংগ্রহ করে আমেরিকায় চাষ করা হয়। পরে সেই তৃণ থেকে তৈরি হতে থাকে ঝাঁটা। উনবিংশ শতাব্দীতে এটি আমেরিকার একটি বড় হস্তশিল্পে পরিণত হয়েছিল।

লণ্ড্রী বা ধোপাখানা

আজকাল কাপড়চোপড়কে পরিষ্কার করতে কতই না উপকরণ বাজারে থরে থরে সজ্জিত থাকে। আর অলিতে-গলিতে যেখানে সেখানে চোখে পড়ে লণ্ড্রীর বিজ্ঞাপন। তোমরা যারা ভারি খুঁতখুঁতে তারা জামা-প্যান্টকে ভাল করে পরিষ্কার করতে এবং ভাঁজ ধরাতে লণ্ড্রীর শরণাপন্ন হয়ে থাকো। কিন্তু জানো কী, আগে কাপড়কে কেমন করে পরিষ্কার করা হতো? কিংবা ঐ লণ্ড্রীর প্রচলন কবে থেকে এবং লণ্ড্রী কথাটির প্রচলন কেমন করে হয়েছে?

মানুষ যেদিন কাপড় তৈরি করে অঙ্গকে আচ্ছাদিত করেছিল সেইদিনই তাকে কাপড়কে পরিষ্কার রাখার উপায় চিন্তা করতে হয়েছিল। কিন্তু সেদিন তো আর আজকের মত এত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি! তাই অপরাপর বহু জিনিসের মত বস্ত্র পরিষ্করণের উপায় প্রকৃতিতে খুঁজতে হয়েছিল। বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর পেয়েছিল ক্ষারযুক্ত মাটি, সামুদ্রিক আগাছার ছাই, ইত্যাদিকে। এদের দ্বারা আবার কাপড়কে অতি সহজে পরিষ্কার করা যেতো না। মাটি বা ছাইকে জলে ফুটাওরে, তাতে কাপড়কে ডুবিয়ে আচ্ছা করে সেদ্ধ করো, অবশেষে কাঠের পাটাতনের উপর আছড়ে আছড়ে অন্তত ঘণ্টাখানেক ধরে কাপড়কে কাচোরে, একেবারে প্রাণান্তকর পরিশ্রম।

প্রাচীনকালে মিশর যে সভ্যতাটি গড়ে তুলেছিল, সে বস্ত্র-পরিষ্কারক হিসাবে লাভ করেছিল তথাকার শুষ্ক হ্রদ অঞ্চলের মৃত্তিকা। ঐ মৃত্তিকাটিকে বলা হয় ট্রোনা। ওতে যথেষ্ট পরিমাণে কাপড় কাচা সোডা থাকে। তাইতো ঐ ট্রোনা দিয়েই মিশরীয়রা কাপড় কাচতো। যেহেতু কাপড় কাচাটা ছিল বড্ড শ্রমবহুল ব্যাপার, তাই ধনীরা বাড়ীতে দাসদাসী রেখে ঐ কাজটি করিয়ে নিতেন। এককথায় সেকালে মিশরের ধনী ব্যক্তি মাত্রেই বাড়ীতে একটা ধোপাখানার

ব্যবস্থা রেখেছিলেন।

ধোপাখানা মিশরেই যে প্রথম উদ্ভব হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মিশরের কোন একটি কবরখানায় পাওয়া ছবি থেকে। ছবিতে আছে, একটি অবনত টেবিলের ত্বপাশে ত্বটি ক্রীতদাস টেবিলের উপর রাখা ভিজে কাপড়ে কাঠের ব্লক ঠুকছে। ব্লকগুলো আবার হাতলযুক্ত। টেবিলের তলায় রাখা হয়েছে একটি জলের পাত্রকে।

মিশরে মনে হয় সর্বসাধারণের জন্য কোন ধোপাখানা ছিল না। এটির প্রচলন হয় গ্রাক আমলে। আরও মনে করা যেতে পারে, ঐ সময় থেকে কিছু কিছু লোক বস্ত্রপরিষ্করণকে ব্যবসা বা পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। রোমান আমলে ব্যবসাটি আরও উন্নত হয়েছিল। রোমানরা যেমন খুঁতখুঁতে ছিলেন তেমনই ছিলেন বিলাসী ও শৌখিন। তাঁরা যে সব দামী দামী পশম ও লিনেনের পোষাক ব্যবহার করতেন, তাকে শুধু সাফ করে দিলে চলতো না। খুব ভাল করে ভাঁজ ধরিয়ে দিতে হতো। এই কাজটি করা হতো ধোপাখানায় এবং যারা করতো তাদের বলা হতো "ফুলার"। পরের দিকে রোমে ঐ ফুলাররাই বস্ত্র বয়ন করতেন, নির্দেশ অনুযায়ী বস্ত্র কেটে পোষাক তৈরি করতেন এবং পোষাক পরিষ্কারও করতেন। অর্থাৎ ফুলাররা একাধারে ছিলেন তাঁতী, দর্জি ও ধোপা।

রোম রাজত্বের অবসান হলো বটে কিন্তু ফুলারদের ব্যবসার অবসান হলো না। বরং নবরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। শেষে কাপড় পরিষ্কার করার পর তাতে প্রয়োগ করা হলো মনমাতানো সুগন্ধি দ্রব্য। আর তখনই বাজারের ধোপাখানার নাম হলো লণ্ড্রী।

লণ্ড্রী কথাটির উদ্ভব হয়েছে ল্যাভেণ্ডার শব্দটি থেকে। ল্যাভেণ্ডার হচ্ছে বৃক্ষজাত একধরনের সুগন্ধি। কথিত আছে, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করার পর তাতে সুগন্ধি প্রয়োগের রীতি প্রথম ফ্রান্সেই প্রবর্তিত হয়েছিল। সে সময় ঐ কাজটি করতো মেয়েরা। এবং যে সব মেয়ে ঐ কাজ করতো অর্থাৎ যারা কাপড় কেচে সুগন্ধি প্রয়োগ করতো তাদের বলা হতো ল্যাভেণ্ডায়ার। কারণ, ল্যাভেণ্ডারের

ফরাসী প্রতিশব্দ ল্যাভেণ্ড। পরে ল্যাভেণ্ডায়ার শব্দটি থেকে ইংরেজী লণ্ড্রী কথাটির উদ্ভব হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে প্রাচ্যের ভারতবর্ষের কথাও বলতে হয়। মিশরীয়রা বস্ত্র ধৌতকরণের উপকরণ হিসাবে যেমন ট্রোনা আবিষ্কার করেছিল, তেমনই ভারত আবিষ্কার করেছিল সাজিমাটিকে। এটিরও প্রধান উপাদান সেই সোডিয়াম কার্বনেট বা কাপড় কাচা সোডা। তাছাড়া কোন কোন গাছের পাতা পুড়িয়ে যে ছাই পাওয়া যেতো তাকেও কাপড় কাচার কাজে ব্যবহার করতো।

মিশরীয় সভ্যতার অনেক পরে হলেও মিশরের মত ভারতেও এক শ্রেণীর মানুষ—যারা বস্ত্র পরিষ্করণে বিশেষজ্ঞ ছিল, তারা পেশা হিসেবেই গ্রহণ করেছিল এবং বংশ পরম্পরায় এই ব্যবসা করতো। অনেক পরে ভারতে জাতপাতের কাঠামোটাকে যখন সুদৃঢ় করা হয়; তখন ওদের সমাজে পতিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ফেলা হয়। পাশ্চাত্যেও একসময় সেই একই ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য ঐ ঘৃণিত ব্যবস্থার অবসান ঘটালেও ভারতে তার জের আজও থেকে গেছে।



প্রাচীনকালের বস্ত্র পরিষ্করণ পদ্ধতি (প্রাচীন মিশরীয় চিত্র)।

পকেটে পয়সা থাকলে মানুষে কিসে ভয় পায় বলো ? সভ্য মানুষের মনে হয় সবচেয়ে বড় বল পয়সায় বল। ওর গুরুত্ব বোঝাতে তোমরা তো কথায় কথায় উল্লেখ করে থাকো "পয়সায় পাথর কাটে," "পয়সা থাকলে বাঘের দুধ মেলে," "পয়সা বিনে সবই ফাঁকা" ইত্যাদি নানা কথা।

সত্যই তাই। পয়সা থাকলে সবই হয় এবং পয়সা না থাকলে মানুষ চোখে সরষের ফুল দেখে। কেননা, পয়সার বদলে সবাই সবকিছু সংগ্রহ করে জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনায় এবং এর গুণে শত্রুও মিত্রে পরিণত হয়। আবার এই পয়সা মানুষকে অমানুষও করে থাকে। মানব জীবনে পয়সার প্রভাব দেখে হয়ত বা তোমরা ভাবো, বিশেষ বিশেষ ছাপযুক্ত টুকরো টুকরো কাগজ এবং টুকরো টুকরো ধাতুর চাকতিগুলোকে এমন একটা বিনিময়ের মাধ্যমরূপে মানুষ কেমন করে খাড়া করেছিল ?

এর উত্তর দেওয়া কিন্তু সহজ নয়। মুদ্রা প্রচলনের পেছনে দীর্ঘকাল ধরে যত প্রচেষ্টা, যত পরীক্ষানিরীক্ষা এবং যত গবেষণা হয়েছিল তার অধিকাংশ হারিয়ে গেছে। এর ইতিহাসের অতি সামান্য অংশমাত্র সংগ্রহ করতে পেরেছেন আজকের গবেষকরা।

প্রথমে উল্লেখ করতে হয় যে, মানব সভ্যতা বিকাশের দীর্ঘকাল পরেও মুদ্রার কোন প্রচলন ছিল না। তখন মানুষ নিজে যা উৎপাদন করতো তার বিনিময়ে অপরাপর প্রয়োজনীয় সামগ্রী লাভ করতো। যে কৃষক ফসল ফলাতো সে ফসলের বিনিময়ে, যে পশুপালন করতো সে পশুর বিনিময়ে, যে মৃৎপাত্র নির্মাণ করতো সে মৃৎপাত্রের বিনিময়ে তার দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতো। তবে সেদিনের মানুষের চাহিদাও ছিল নিতান্ত কম। বড় চাহিদা ছিল অন্ন ও বস্ত্রের। এগুলি আসতো বিনিময়ের মাধ্যমে এবং অপরাপর প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে

অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদনই করে নিতো।

বিনিময়ের প্রথাটা কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে সমাজে চলে আসছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সমাজের জটিলতা বেড়ে ওঠায় কালক্রমে উদ্ভব হলো নানা সমস্যা। তখনই মানুষ চাইলো একটা বিশেষ কোন জিনিসের বিনিময়ে যেন সবকিছু সে লাভ করতে পারে। উক্ত মানসিকতার অবশ্য একদিনে বা এক আধ বছরে জন্ম হয়নি—অতিবাহিত হয়েছিল বেশ কয়েকশ' বছর।

গবেষকদের অনুমান প্রথম প্রথম মানুষ মূল্যবান ধাতুখণ্ড, তথা সোনা বা রূপোর টুকরোর পরিবর্তে সব জিনিসকে লাভ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। তারপরে সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর দিকে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে মূল্যবান ধাতুর বিশেষ বিশেষ টুকরা প্রচলন করা হয়েছিল বিনিময়ের মাধ্যম বা মুদ্রা হিসাবে। তবে আদিকালের এই মুদ্রায় কোন ছাপ ছিল না। আর ঐ সময় থেকে মনে হয় ভারতে মুদ্রা হিসাবে কড়ির প্রচলন হয়েছিল।

মুদ্রার গায়ে ছাপ দিয়ে নির্দিষ্ট মানের মুদ্রা প্রচলনের কৃতিত্ব অনেকের মতে এশিয়া মাইনরের লাইডিয়ানদের। লাইডিয়ানদের পরে শুরু করেছিল চীনারা। তারপর ওদেরই দেখাদেখি অন্যান্য দেশ মুদ্রা প্রচলনের যৌক্তিকতা অনুভব করে এবং লাইডিয়ানদের অনুকরণে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর দিকে অধিকাংশ দেশের রাজা মুদ্রার প্রচলন করেন। এবার ব্যবহার করা হয় নির্দিষ্ট আকার ও ওজনের ধাতব চাকতি। কোন কোন রাজা আবার নিজের নাম ও ছবির ছাপ দিয়ে মুদ্রাকে চালাতে শুরু করেন!

এইসব মুদ্রার কিন্তু অসুবিধা ছিল অনেক। কেবলমাত্র সোনা ও রূপাকে মুদ্রা নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হতো এবং বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করার জন্য অসাধু ব্যক্তিরা চাকতি থেকে কিছু অংশ কেটে রেখে দিত। ফলে কয়েক হাত ঘোরাফেরার পর মুদ্রাটির প্রকৃত মূল্য আর বজায় থাকতো না।

উপরোক্ত অসুবিধাগুলো দূর করা হয় মধ্যযুগে। আগেকার মত

সেই ধাতুর গোল চাকতিই বজায় রইলো, তবে যাতে কেউ কেটে নিতে না পারে তার জন্য চাকতির চারপাশে খাঁজ কাটার ব্যবস্থা হলো। কোন কোন জায়গায় সোনা ও রূপার পরিবর্তে অন্যান্য অল্পমূল্যের ধাতুকে ব্যবহার করা হলো এবং তাতে থাকলো রাজার "অঙ্গীকার"। অর্থাৎ মুদ্রা তৈরির জন্য ব্যবহৃত ধাতুর মূল্য যাই হোক না কেন কেবলমাত্র অঙ্গীকারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অর্থমান ধরা হলো। যেমন, ভারতের মহম্মদ-বিন-তুঘলক মধ্যযুগে নামে মাত্র মূল্যের তামার পাতকে অঙ্গীকারের মাধ্যমে মোটা টাকার নোটের আকারে চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। যদিও প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন না করায় ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি।

মধ্যযুগের পরে ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনাবেচা ইত্যাদির সুবিধার জন্য বিভিন্ন মানের মুদ্রার প্রচলন হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পরিণতি দাঁড়ায় কাগজীমুদ্রার। বর্তমানে সবদেশেই ঐ উভয় প্রকারের মুদ্রা অঙ্গীকারের মাধ্যমে চালানো হয়ে থাকে।

চিড়িয়াখানা

চিড়িয়াখানার নাম শুনলে কার না মন আনন্দে নেচে ওঠে না! শুধু কী তাই? চিড়িয়াখানায় ঢুকলে জন্তু-জানোয়ার দেখতে দেখতে সময়গুলো কী ভাবে যে কেটে যায়—বুঝতেই পারি না। আবার বেরিয়ে আসার সময় মনে হয়, দেখার বুঝি অনেক বাকি থেকে গেল।

চিড়িয়াখানার মত এমন একটা আনন্দদায়ক জিনিস বোধ হয় দ্বিতীয় খুঁজে পাবে না। তাছাড়া তোমাদের শিক্ষার্থীদের পক্ষে অতি বড় শিক্ষণীয় জায়গা। আর যাঁরা জন্তু-জানোয়ারদের নিয়ে গবেষণা করেন? তাঁদের তো চিড়িয়াখানা না হলে চলেই না। সত্যি প্রথম কার মাথায় ঐ চিড়িয়াখানার পরিকল্পনাটা যে এসেছিল!

পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে বহু খোঁজখবর নিয়েছেন। তাঁদের মতে প্রথম চিড়িয়াখানা স্থাপিত হয়েছিল চীন দেশে। সে চিড়িয়াখানাটি অবশ্য সাধারণের জন্য ছিল না। খ্রীষ্টপূর্ব ১১৫০ অব্দ বা তারই কাছাকাছি কোন এক সময়ে জনৈক চীন সম্রাট আনন্দোপকরণ হিসাবে চিড়িয়াখানা স্থাপন করেছিলেন আপন প্রাসাদের অভ্যন্তরেই। রাজা এবং রাজপরিবারের অন্যান্যরা সেই চিড়িয়াখানায় গিয়ে সময় কাটাতেন। জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে ছিল কয়েকজাতের হরিণ, নানা ধরনের পাখী এবং কিছু কিছু মাছ।

চিড়িয়াখানা স্থাপন একটি বিরাট খরচবহুল ব্যাপার বলে খুব বেশী কেউ ওর প্রতি আকর্ষণবোধ করতেন না। দীর্ঘকাল ধরে কিছু কিছু রাজা এবং রাজপুরুষেরাই বিলাসোপকরণ হিসাবে স্বীয় প্রাসাদে ছোটোখাটো একটা চিড়িয়াখানার মত ব্যবস্থা রাখতেন। তাতে হিংস্র জন্তু আদৌ থাকতো না। হরিণ ও পাখীদের সংখ্যাই থাকতো বেশী। রোমান আমলে অবশ্য বন থেকে হিংস্রজন্তুকে ধরে এনে খাঁচায় পুরে রাখা হতো। তবে চিড়িয়াখানার উদ্দেশ্যে নয়।

অপরাধীদের শাস্তিদানের এক নির্মম ব্যবস্থা।

সর্বসাধারণের জন্য যে চিড়িয়াখানা—তার জন্ম কিন্তু একেবারে আধুনিক কালে। এটি স্থাপিত হয়েছিল ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে। এই প্রথম দেশবিদেশের পশুপাখীকে রাখার ব্যবস্থা হয় এবং তাতে হিংস্র জন্তুরাও স্থান পায়।

প্যারিসের সেই চিড়িয়াখানাটাকে সাধারণের শিক্ষাদানের একটা মাধ্যমরূপেই গড়া হয়েছিল। এতে রোপন করা হয়েছিল নানা জাতের উদ্ভিদ। তাছাড়া একটি যাদুঘর বা মিউজিয়ামও স্থাপন করা হয়েছিল। অর্থাৎ একাধারে এটি ছিল জুলজিক্যাল গার্ডেন বা চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন ও মিউজিয়াম।

প্যারিসের পর সাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত কেবলমাত্র জুলজিক্যাল গার্ডেনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল লণ্ডনের রিজেণ্ট পার্কে। সেটি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল ১৮২৯ সালে। অতঃপর ১৮৪৪ সালে বৃস্টলে যে চিড়িয়াখানাটি স্থাপন করা হয়েছিল সেইটিই ছিল সে আমলের পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম চিড়িয়াখানা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে চিড়িয়াখানার গুরুত্ব সবদেশই উপলব্ধি করতে থাকে এবং জনসাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত প্রতিটি দেশই চিড়িয়াখানা স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠে। বর্তমানে চিড়িয়াখানা নেই—এমন কোন দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এবং বৃস্টলের চেয়েও বহু বড় বড় চিড়িয়াখানা স্থাপিত হয়েছে। এর জন্য জাতীয় সরকারকে যেমন প্রচুর অর্থব্যয় করতে হয় তেমনই সবদেশের সব রকমের জীবজন্তুর পরিবেশও সব জায়গায় গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। তাই জীবজন্তু সম্বন্ধে ভালভাবে জ্ঞানলাভ করতে হলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের চিড়িয়াখানাগুলোকে ঘুরে ঘুরে দেখতে হয়।

প্রসঙ্গক্রমে তোমাদের বলতে হয় যে, চীনদেশে যে সময় চিড়িয়াখানা স্থাপন করা হয়েছিল তখন ভারতে আশ্রমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ছিল। গুরুরা জনকোলাহল থেকে দূরে-নির্জনে বনে-উপবনে আশ্রম স্থাপন করতেন। সেই আশ্রমগুলিও ছিল এক

একটি ছোটখাটো জুলজিক্যাল গার্ডেন। সেখানে নানা জাতের হরিণ থাকতো, রঙ-বেরঙের হরেক রকম পাখী থাকতো, এমনকি দু-একটা বাঘ সিংহও থাকতো। তবে এরা নাকি হিংসা করতো না। হয়ত আশ্রমে তাদের পোষ মানিয়ে রাখা হত। আরও আশ্চর্যের বিষয়, আধুনিককালে প্যারিসে প্রথম যে ধরনের চিড়িয়াখানার পরিকল্পনা করা হয়েছিল ঠিক সেই ধরনেরই চিড়িয়াখানা ও বোটানিক্যাল গার্ডেন ছিল সেকালের আশ্রমগুলি। অর্থাৎ সেখানে নানা ধরনের গাছপালা তথা হাজার হাজার বনৌষধিকে রোপণ করা হতো। তবে মিউজিয়ামের মত কোন জিনিস ছিল কিনা বোঝা যায় না। দুঃখের বিষয়, আজকের গবেষকরা ভারতের সেই সব আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করেন না বা বিদেশী গবেষকরা ভারতের নিজস্ব যে কিছু ঐতিহ্য ছিল এবং নতুন কিছু যে উদ্ভাবন করেছিল—এটি বিশ্বাস করতে চান না।

ছবি আঁকা ও মূর্তি গড়া

ছবি তোমাদের দেখতে আনন্দ, আঁকতেও আনন্দ। শুধু তোমরা কেন, বড়রাও ছবি হাতে পেলে দু-দণ্ড দেখতে চায়, তন্ময় হয়ে ভাবতে চায়, হাতের কাছে রঙ-তুলি পেলে আনমনে কাগজের উপর আঁচড়ও কাটতে চায়। তোমরা যারা ভালভাবে ছবি আঁকতে পার না, তারা সুন্দর সুন্দর ছবি দেখলে নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবো—হায়রে হায়, আমিও যদি এমন একখানা ছবি আঁকতে পারতাম!

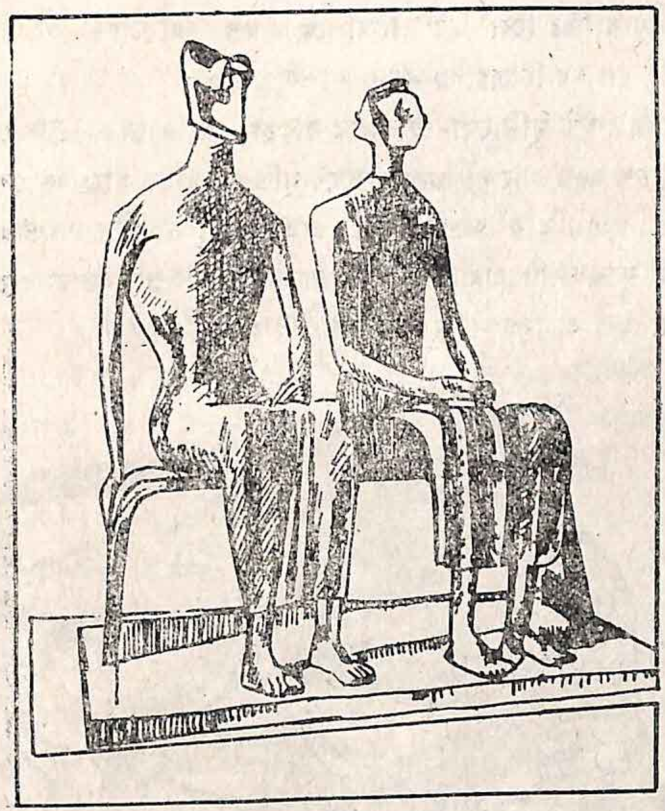
সত্য কথা বলতে কী, ছবি আঁকাটা মানুষের যেন একটা সহজাত প্রবৃত্তি। সেই কবে—কোন্ প্রাচীনকালে, যেদিন মানুষের মুখে কোন ভাষা আসেনি, খেলার পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয়নি, সেদিনও মানুষ আঁকতো ছবির পর ছবি। সে সব ছবির অধিকাংশই ছিল জীবজন্তুর ছবি এবং শিকারের ছবি। বন্যপ্রকৃতির বুকে বিচরণকারী নানা ধরনের জীবজন্তুকে দেখে মনের খেয়ালে রূপ দিতো গুহাপাত্রগুলিতে।

যেহেতু সেকালে মানুষ পুরুষাণুক্রমে এক একটি গুহায় কাটিয়ে দিত। পুরুষাণুক্রমেই তারা এঁকে গেছে ছবি। তাই প্রতিটি গুহা-গাত্র ভরে আছে ছবিতে ছবিতে। আজকের দিনেও তাদের আঁকা ছবিগুলি এক একটি বিস্ময় হয়েই থেকে গেছে।

বিভিন্ন নিদর্শন থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন, মানুষ পুরাতন প্রস্তরযুগেই ছবি আঁকা রপ্ত করেছিল। মানুষ গুহা ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর আর ছবি আঁকার বিশেষ সুযোগ পায়নি। চারদিকে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হতো, নানা ধরনের যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতে হতো, এবং পাথর কাটতে হতো। তাই একদিকে ছবি আঁকতে সময় যেমন ছিল না, অপরদিকে তেমনই ছবি আঁকার জায়গা এবং সরঞ্জামেরও অভাব ছিল। প্রায় পাঁচ হাজার বছরকাল মানুষের ছবি আঁকায় ভাটা পড়েছিল।

পুনরায় ছবি আঁকার প্রতি মানুষ আকর্ষণবোধ করে নগরসভ্যতা

পত্তনের যুগে। এ বিষয়ে মিশরীয়রা মনে হয় অধিক অগ্রসর হতে পেরেছিল। তারা আবিষ্কার করেছিল প্যাপিরাসকে এবং আবিষ্কার করেছিল চিত্রলিপি। অপরদিকে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানও প্রবৃত্ত করিয়েছিল ছবি আঁকতে।

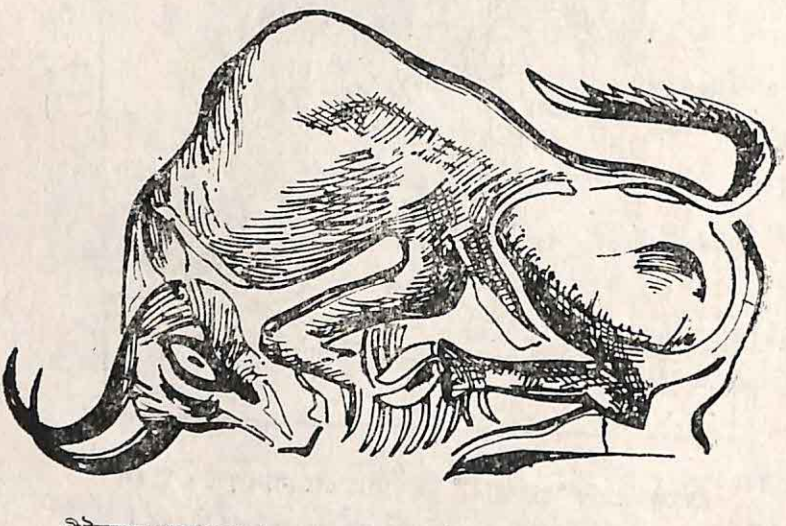


ব্রোঞ্জের তৈরি "রাজারানী" [ইতালীয় রেনেসাঁস যুগে মাইকেল এঞ্জেলোর তৈরি পৃথিবীর মূর্তি শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন]

মিশরীয়রা পরলোককে বিশ্বাস করতো। তাদের আরও ধারণা ছিল, মানুষের ইহকালটা অতি সামান্য সময়। আবহমানকাল ধরে কাটাতে হয় পরলোকে এবং পরলোকেও ইহকালের মত ভোগসুখে কাটাতে পারে যদি ইহকালে ব্যবহৃত জিনিসপত্র মৃতদেহের সঙ্গে

কবরে পাঠানো যায়। তাই মৃতদেহকে অক্ষত রাখার জন্য যেমন মমিতে পরিণত করতো, তেমনই দৈনন্দিন জীবনে যে যা কিছু ব্যবহার করতো সবগুলিকে কবর দিত। উক্ত ব্যবস্থা প্রধানত রাজাদের ক্ষেত্রে অবলম্বন করা হতো এবং রাজার জীবনের উল্লেখযোগ্য কাহিনীগুলির চিত্র কবরগাত্রে অঙ্কিত করা হতো। ফলে সেকালে মিশরে চিত্রকরের খুব খাতির ছিল এবং চিত্রশিল্পে দারুণ উন্নতিলাভ করেছিল মিশর। সে সব চিত্রের বহু নমুনা পাওয়া গেছে।

পাথর কেটে মূর্তি খোদাই করার ব্যবস্থাও বহু প্রাচীন। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় পাঁচশ বছর আগে শিল্পসম্মতভাবে মূর্তি-খোদাইর কাজ বহু দেশে শুরু হয়। এ বিষয়ে অগ্রণী ছিল ভারত, চীন ও গ্রীস। ভারতে ভগবান বুদ্ধের তিরোধানের পরে ভাস্কর্যশিল্পে স্বর্ণযুগের সূচনা হয়েছিল এবং পালযুগ পর্যন্ত চলেছিল সেই ধারাটি।



খ্রীষ্টজন্মের পনের হাজার বছর আগে গুহাগাত্রে অঙ্কিত বাইসনের ছবি

পতাকা

তোমরা নিশ্চয়ই জানো, প্রত্যেক রাষ্ট্রের বিশেষ বিশেষ প্রতীক সম্বলিত এক একটি পতাকা আছে। বিশেষ-বিশেষ অনুষ্ঠানে তোমরা অবশ্যই তোমাদের চক্রলাঞ্ছিত ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতকাকে অভিবাদন জানাও। স্কুলে, কলেজে, অফিসে, আদালতে যখন জাতীয় পতাকা পত্ পত্ করে উড়তে থাকে, তখন তোমাদের অনেকেরই হয়ত মনে আসে পতাকার প্রচলন কবে থেকে এবং কেন ?

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে, কেবলমাত্র রাষ্ট্রের নয়, বিভিন্ন সংগঠনেরও এক একটি বিশেষ ধরনের পতাকা থাকে। ঐক্যবোধ জাগিয়ে তুলতে, নিজের অধিকারকে জাহির করতে, পতাকা একেবারেই অপরিহার্য এবং এই উদ্দেশ্যেই প্রথম পতাকার উদ্ভব হয়েছিল হাজার হাজার বছর আগে। এমনকি সেই প্রস্তরযুগে—যেদিন মানুষ শিকার করে ঘুরে বেড়াতো, ঠিক সেই সময়েই।

কতকগুলো নমুনা থেকে জানা গেছে, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব যখনই দেখা দিয়েছিল মানুষের মধ্যে, তখনই বিভিন্ন দলের মধ্যে লড়াই শুরু হয়। এর ফলে বহু দল ও উপদল বারে বারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং বলশালীরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আদিকালের সেই সব লড়াইতেও পতাকার ব্যবহার হতো। তবে সে পতাকা ছিল পশুচর্ম দিয়ে নির্মিত। অপরপক্ষে পতাকার প্রতীক ব্যবহারও সেই যুগের। পতাকার প্রতীক দেখেই যোদ্ধারা বুঝতো কে শত্রু এবং কে মিত্র। কেউ কেউ পাখীর পালকের তৈরি পতাকাও যে ব্যবহার করতো এমন দু-একটি নজিরও আবিষ্কৃত হয়েছে।

তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগে পতাকাকে ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। প্রাচীন মিশরের পতাকা ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের। এটি দেখতে ছিল একটি দণ্ডের মত। দণ্ডের মাথায় ছিল উড়বার উপক্রম করছে এমন একটি পাখী। দণ্ডটি উপরের দিকে ক্রমশঃ মোটা এবং ঐ

পাখীটি ছিল তার প্রতীক।

কাপড়ের পতাকার প্রথম প্রচলন হয় প্রাচ্যের ভারতবর্ষে ও চীনে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, খ্রীষ্টজন্মের প্রায় হাজার বছর আগে পতাকার ক্ষেত্রে কাপড়ের পরিকল্পনা করেছিল এই দুটি দেশ। তার পরে ব্যবহার করেছিলেন রোমানরা।

পাশ্চাত্যে পতাকার ব্যাপক প্রচলন শুরু হয় ধর্মযুদ্ধ নামে খ্যাত ক্রুসেডের সময় থেকে। প্রথম প্রথম পতাকার ব্যবহার আবার সীমিত ছিল। দেশের রাজা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই ব্যবহার করতেন। তাতে যে প্রতীক থাকতো তা বংশানুক্রমিক অনুসৃত হতো।

জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা সম্ভবত ডেনমার্কই করেছিল ১২১৯ খ্রীষ্টাব্দে। পতাকাটি ছিল লাল রঙের এবং এতে প্রতীক ছিল মাঝখানে সাদা ক্রশচিহ্ন এবং ক্রশচিহ্নের দাগ পতাকার প্রান্তগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বিজ্ঞাপন ও পোষ্টার

রেডিও, টিভি খুললে, খবরের কাগজের পাতা ওল্টালে, সিনেমা দেখতে বসলে, কত মজার মজার বিজ্ঞাপন না চোখে পড়ে তোমাদের। তাছাড়া বাজারে বেরুলে তো কথাই নেই। যত দোকান তত বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপন দেওয়ার রীতি কবে থেকে শুরু হয়েছিল এবং প্রথম প্রথম দোকানদাররা কেমন ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা করতো, তা হয়ত তোমাদের অনেকেরই জানতে আগ্রহ।

শোন তাহলে। বিশেজ্ঞরা মনে করেন, মানুষ যখন থেকে চাষ-বাসের মাধ্যমে ফসল ফলিয়েছিল সেই দিন থেকেই সূত্রপাত বিজ্ঞাপনের। সেদিন তো আর লেখার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়নি! তাই যারা বাজারে ফসল আনতো, হাঁড়ি-কুড়ি-চ্যাঙাড়ি-চুপড়ি আনতো, কিংবা ধাতুর তৈরি জিনিসপত্র আনতো, তারা নিজেদের মালের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে নিজ নিজ মালের গুণগান করতো। যে পদ্ধতিটি এখনও প্রায় সমানেই অনুসরণ করে আসছেন ফেরি-ওয়ালারা এবং ফুটপাথের দোকানদাররা। তাঁদের দোকানের সামনে গিয়ে পড়লে তাঁরা যেমন তোমাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, অনেকটা তেমনই ছিল আদিকালের বিজ্ঞাপন।

শহরের পত্তন হওয়ার পর শহরে শহরে স্থায়ী দোকান যখন স্থাপিত হয়, তখন দোকানদাররা দোকানের সামনে কিংবা দেওয়ালে মালের ছবি এঁকে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। অতঃপর লেখার পদ্ধতি যখন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তখনই মালের ছবির তলায় মালের নাম এবং দোকানের নাম ইত্যাদিও লিখতে শুরু করেন। তবে অধিকাংশ দোকানদার ঘোষকও রাখতেন। বর্তমানে উভয় ব্যবস্থা এখনও কতকাংশে চালু আছে বলা যায়।

বিজ্ঞাপনের প্রকৃত সূত্রপাত হয়েছে ছাপাখানা উদ্ভবের পর থেকেই। সংবাদপত্র আত্মপ্রকাশের পূর্বে জনসমক্ষে কোন কিছুকে

প্রচার করতে হলে প্রাচীরপত্র ছাপিয়ে এখানে সেখানে, শহরের রাস্তায় রাস্তায় দেওয়ালে কিংবা গাছে এঁটে দেওয়া হতো। যতদূর জানা যায়, সর্বপ্রথম ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম কক্সটন নামে একব্যক্তি কতকগুলো ধর্মীয় গ্রন্থের অনুরূপ ছাপানো প্রাচীরপত্রের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরের দিকে খবরের কাগজ প্রকাশিত হলে বিজ্ঞাপনেরও শুরু হয় সুবর্ণযুগ।



উইলিয়ম কক্সটন

পোস্টার কথাটি এসেছে পোস্ট বা খুঁটি থেকে। এককালে তিনটি বা চারটি রাস্তার মিলনস্থলে বা বাজারের বিশেষ বিশেষ জায়গায়, যেখানে লোকজনের চলাচল বেশী ছিল সেইখানে সর্ব-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কোন ঘটনা, কারও কোন উৎপন্ন জিনিস, এমনকি চাকরি-বাকরির কথাও হাতে সুন্দর করে লিখে খুঁটি পুঁতে তার গায়ে এঁটে দেওয়া হতো। অবশ্য রাস্তার ধারে বড় বড় গাছ এবং বাড়ীর দেওয়ালকেও এ-কাজে ব্যবহার করা হতো। কত-

গুলো নমুনা থেকে জানা গেছে, খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দেও অনুরূপ ব্যবস্থা মিশরে গ্রহণ করা হয়েছিল। পরবর্তী গ্রীক আমলে উক্ত পদ্ধতি ছিল আরও জনপ্রিয়।

আধুনিক কালেও অনুরূপ পোস্টার চোখে পড়ে। তবে পোষ্টারেরও উন্নতি হয়েছে ছাপাখানা স্থাপিত হওয়ার পর থেকে। অবশেষে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিথোগ্রাফী আবিষ্কারের পর পোষ্টারের আধুনিক যুগ শুরু হয়েছে।

সকালে উঠে একখানা খবরের কাগজ হাতের কাছে না পেলে অনেকেরই মন খারাপ হয়ে যায়। তোমরাও কী কাগজের কম ভক্ত? টাটকা টাটকা খবর জানতে, অজানা তথ্যগুলোকে সংগ্রহ করতে, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছবি দেখতে কিংবা মজার মজার বিজ্ঞাপনগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে কতই না আগ্রহ তোমাদের! তাছাড়া ঐ খেলার খবরের পাতাটা!

সত্যি, খবরের কাগজ ছাড়া আজ যেন মানবসভ্যতা ভাবাই যায় না। যন্ত্রপাতির অসাধারণ উন্নতির ফলে, দ্রুতগ্রামী যানবাহন সব আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এবং দেশে দেশে সংবাদ সরবরাহের প্রতিষ্ঠান-গুলো গড়ে ওঠার ফলে সারা পৃথিবীটা এখন আমাদের নখদর্পণে। নিশ্চয়ই তোমাদের ভাবতে ইচ্ছে হয়, পৃথিবীতে প্রথম কোন্ লোকটার মাথায় এমন একটা সুন্দর পরিকল্পনা স্থানলাভ করেছিল এবং এর শুরুই বা কবে থেকে।

খবর রাখার আগ্রহটা মানুষের যেন সহজাত। তবে যতদিন পর্যন্ত লেখার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি ততদিন পর্যন্ত খবর লিখে সরবরাহ করা একেবারেই সম্ভব হয়নি। তাছাড়া সভ্যতার সেই আদিতে খবর রাখার কোন প্রয়োজনও অনুভব করতো না মানুষ। তাদের সমূহ-চিন্তাভাবনা দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

লিপির উদ্ভব হলে এবং নগর সভ্যতার পত্তন হলে খবর আদান-প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল মানুষ। এর একমাত্র কারণ ছিল বাণিজ্যিক যোগাযোগ ও অপরের রাজ্যগ্রাস। তবে পৃথিবীটা সেদিন অনেক বড় ছিল তাদের কাছে। যে সব জায়গায় উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেই সব জায়গায় বণিকেরা নিজেরাই যাতায়াতের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করতেন আর রাজ-রাজড়ারা চর নিযুক্ত করতেন। তাই বিদেশের তো দূরের কথা, স্বদেশেরই খবর

অজ্ঞাত থাকতো জনসাধারণের কাছে।

মনে হয় প্রথম গ্রীকরাই সর্বসাধারণের মধ্যে খবর পরিবেশনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। সে সময় পৃথিবীতে এঁরাই একমাত্র জ্ঞানের অনুশীলনে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন এবং দেশে গণতন্ত্রেরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেশের পরিস্থিতি আলোচনার জন্য তারা মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ স্থানে মিলিত হতেন। প্রয়োজনীয় সংবাদগুলিকে আবার সাধারণের জ্ঞাতার্থে জনবহুল এলাকাগুলিতে হাতে লিখে ঝুলিয়ে দিতেন। এই ব্যবস্থাকে অবশ্য সংবাদপত্র আখ্যায় ভূষিত করা যায় না, তবে সংবাদ পরিবেশনের প্রাথমিক ব্যবস্থারূপে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

জনসাধারণের হাতের কাছে সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার যে পরিকল্পনা সেটি মধ্যযুগেরই অবদান বলতে হবে। ছাপাখানা গড়ে ওঠার পর এই ব্যবস্থাটা কারও কারও মাথায় স্থানলাভ করেছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে উক্ত ব্যবস্থাটা প্রথম কার্যকর করে তুলেছিল ভেনিস। ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভেনিস থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল একটি সংবাদপত্র। দাম দিয়ে যে কেউ কিনে নিয়ে পড়তে পারতো এবং দাম ছিল ভেনিসের প্রচলিত মুদ্রায় "এক গেজেট"। মজার কথা এই যে, ভেনিসের মুদ্রার নামেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রের নাম হয়েছিল ঐ "গেজেট"।

ভেনিসের পরে সম্ভবতঃ প্রায় একই সময়ে জার্মান ও ইংরাজরা নিজ নিজ দেশে খবরের কাগজের প্রচলন করেছিলেন। প্রথম প্রথম ইংরাজেরা ছোট ছোট কাগজে কিছু কিছু সংবাদ ছেপে সরবরাহ করতেন ক্লাবে ও কফি হাউসে। মুখরোচক সংবাদগুলি জনসাধারণ পড়তেন এবং বেশ মনের খোরাকও জোগাড় করতেন। অতি অল্প-সময়ের মধ্যে এই ব্যবস্থা খুব জনপ্রিয় হয়েও উঠেছিল। তবে এতে বিদেশের সংবাদ খুব বেশী থাকতো না। সংবাদদাতারা কেবলমাত্র স্থানীয় কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করে পরিবেশন করতেন।

দেশ-বিদেশের সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে সংবাদপত্রের প্রকৃত

রূপ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম রূপকার ইংলণ্ডের স্যার রজার লেস্টেঞ্জ। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের যে কাগজটি প্রকাশ করেছিলেন তার নাম ছিল "দি পাবলিক ইনটেলিজেন্স"। জন্ম মাত্রই এটি জনপ্রিয়তার উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল।

সেকালে রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী বিমান ইত্যাদি কোন কিছু আবিষ্কৃত না হওয়ায় খবরের কাগজকে ঘোড়ায় করে বিলি করা হতো। খরচও পড়তো অনেক। তাই খুব বেশী সংবাদপত্র সেদিন আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি এবং পৃথিবীর সবদেশও আগ্রহী হয়ে ওঠেনি।

সংবাদপত্রের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেলে এবং যানবাহনের উন্নতি হলে প্রতিটি দেশ খবরের কাগজ প্রকাশ করতে শুরু করে। উঁচুমানের সংবাদপত্র প্রথম ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। নাম ছিল 'মর্নিং পোস্ট'। ভারতে ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছে অনেক পরে। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তাই খবরের কাগজও পাশ্চাত্যের তুলনায় অনেক পরে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছে। এক-রকম ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের শুভ সূচনা হয়। প্রথম সংবাদপত্রটির নাম 'বেঙ্গল গজেট'। এটি ছিল ইংরাজী কাগজ এবং প্রকাশিত হয়েছিল কলিকাতা থেকে। প্রথম বাংলা কাগজের নাম 'বাঙ্গালা গেজেট'। সম্পাদক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য।

ঘড়ি

তোমরা দেখেছো, আজকের মানুষকে সারাটা দিন একরকম ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়াতে হয়। সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরও মনে সময় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা আসে। পড়া, নাওয়া, খাওয়া, বিদ্যালয়ে যাওয়া, সবই সময় মাফিক করতে হয় তো! একটু এদিক ওদিক হলেই ব্যস্—সব গোলমাল, সব মাটি! তাহলে প্রতিদিনের কাজে তোমাদের, আমাদের, সবারই সময় সম্বন্ধে সচেতন হতে হলে চাই একটি ঘড়ি। ঘড়ি বিনে আজকের জীবনযাত্রা যেন অচল।

ঘড়ি সম্বন্ধে তোমরা নিশ্চয়ই কৌতূহল অনুভব কর। কেমন চমৎকার জ্যান্ত একটা জীবের মত টিক টিক করতে করতে ঘড়ির কাঁটাটা ছুটতে থাকে, ভেতরে কত হরেক রকমের কারিগরি, রাতেও জ্বল জ্বল করে জ্বলে কাঁটা ও দাগগুলো। ভারি সুন্দর তাই না! আর এও হয়ত ভাবো কে, কবে, কেমন করে ঘড়ি আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষের সভ্যতাকে এমন গতিশীল করার উপায় উদ্ভাবন করেছিল আর কেমন করে মহাকালের রথের চাকাটা আটকা পড়েছিল সময়ের বাঁধনে?

ঘড়ি না হোক সময়ের হিসেব রাখার ব্যবস্থাটা আজকের নয়। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে—সেই প্রথম নগর সভ্যতার পত্তনের সময়েও বিশেষ বিশেষ উপায়ে সময় ঠিক রাখার চেষ্টা করেছিল মানুষ। প্রধানত তারা আকাশের সূর্য দেখেই ঠিক করতো সময়। এই উদ্দেশ্যে দিনের বেলায় কোন খোলা জায়গায় একটা লাঠি পুঁতে রাখতো এবং লাঠির ছায়া মেপে সময় নির্ধারণ করতো। একে বলা হতো সূর্য ঘড়ি।

কিন্তু মেঘলা দিনে এবং রাত্রিবেলায় খুবই অসুবিধা হতো। তাই বিভিন্ন দেশের জ্ঞানী-গুণীরা সময় পরিমাপের জন্য অন্যান্য যে সব ব্যবস্থা

অবলম্বন করতেন তাদের মধ্যে বালিঘড়ি ও জলঘড়িই প্রধান। এই দুই ব্যবস্থার সরঞ্জাম ছিল অতি সাধারণ। দরকার হতো মাত্র দুটি কাচ পাত্রের। তলায় খালি পাত্রটির উপর উপুড় করিয়ে রাখা হতো বালি কিংবা জলপূর্ণ অপর পাত্রটিকে। উপরের পাত্রটির মুখ ছিপি দিয়ে বন্ধ করা হতো। সেই ছিপিতে থাকতো সূক্ষ্ম একটা ছিদ্র। পাত্রটিকে ঝুলিয়ে রাখারও সরঞ্জাম ছিল। সেখান থেকে ঝুর ঝুর করে বালি অথবা ফোঁটা ফোঁটা করে জল পড়তো তলার পাত্রে। তলার পাত্রের গায়ে কেউ কেউ দাগও কেটে রাখতেন। নির্দিষ্ট দাগ নির্দিষ্ট সময়ের সূচক ছিল। অপরপক্ষে পাত্র খালি হয়ে গেলেও একটা বিশেষ সময় জ্ঞাপন করতো।



মোমবাতির দ্বারা সময় নির্দেশ

সেকালে জলঘড়ি প্রাচীন ভারতবর্ষ সহ বহু দেশেই প্রচলিত ছিল। এর নমুনা কিন্তু সংগ্রহ করা গেছে। প্রখ্যাত মার্কিন ঘড়ি সংগ্রহকারী জ্যাক উইলি এমন একটি জলঘড়ি সংগ্রহ করেছিলেন, যেটির ব্যবহার হয়েছিল খ্রীষ্টজন্মের প্রায় পাঁচশ বছর আগে। পরের

দিকে মোমবাতিতে দাগ কেটে এবং তাকে পুড়িয়েও সময় নিরূপণ করা হতো।

যন্ত্রচালিত ঘড়ির প্রথম পরিকল্পনা করেছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে প্রখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী আর্কিমিদিস। কথিত আছে, তিনিই প্রথম ভার ও স্প্রীং-এর সাহায্যে ঘড়ি তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন। স্প্রীং দিয়ে কাঁটা ঘোরানো এবং কাঁটার সাহায্যে সময় নির্দেশ, ইত্যাদির পরিকল্পনাও তাঁরই। তবে দম দিয়ে ঘড়ি চালানোর কৌশল উদ্ভাবন করেছেন ক্রিশ্চিয়ান হাইঘেনস ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকৃতপক্ষে হাইঘেনসই আজকের ঘড়ির প্রথম রূপকার।

পেণ্ডুলামের সাহায্যে ঘড়িকে চালিত করার পদ্ধতি বেশ পুরাতন



জলঘড়ি

বলেই অনেকে মনে করেন। আর্কিমিদিসের পরিকল্পনা মত পেণ্ডুলাম দুলিয়ে সময়ের বিভাগ করার নীতি নাকি প্রথম উদ্ভাবন করেছিলেন ১০০০ খ্রীস্টাব্দে স্পেনের কলডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র। অন্যান্য অনেকের মতে মহামতি গ্যালিলিও দোলকের দোলন সংক্রান্ত তথ্যগুলি আবিষ্কার করলেই পেণ্ডুলাম-

যুক্ত ঘড়ির প্রচলন হয়েছে।

বর্তমানে ঘড়ির অনেক উন্নতি হয়েছে। আজকের ইলেকট্রনিক্সের যুগে সময়ের অতি সূক্ষ্ম পরিমাপও পাওয়া যায়। এখন আবার নানা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় এক সেকেণ্ডের সহস্র সহস্র ভাগেরও সময় জানার দরকার হয়ে থাকে। এমন ক্ষেত্রে ঘড়ি অচল। তার বদলে ব্যবহার করা হয় ক্রনোমিটার নামক যন্ত্রটিকে।

বিদ্যালয়

তোমরা নিশ্চয়ই জানো, একমাত্র শিক্ষাই মানুষকে মানুষের পর্যায়ে উন্নীত করায়। শিক্ষার দ্বারা মানুষ দ্বিজত্ব লাভ করে, শিক্ষার দ্বারা সারা জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করে এবং শিক্ষার দ্বারা সামাজের সমূহ দায়-দায়িত্ব পালন করে। অতএব শিক্ষাহীন জীবন পশুর সমান।

আজকের দিনে আবার শিক্ষাব্যবস্থার যেমন প্রভূত উন্নতি হয়েছে, তেমনই জ্ঞানের শাখাগুলিও বৃদ্ধি পেয়েছে অকল্পনীয়ভাবে। বিশ্ব-মাঝে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে তাই শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। আর ঐ কারণেই তোমাদের প্রত্যেককেই পড়াশোনার জন্য এগিয়ে আসতে হয়। জীবনের একটা বড় অংশ অতিবাহিত করতে হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে। বিদ্যালয়পথে চলতে চলতে তোমাদের একবার না একবার মনে আসে, শিক্ষাব্যবস্থা কেমন করে চালু হলো মানবসভ্যতার মধ্যে এবং বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা বা কেমন করে করেছিল?

সত্য বলতে কী, ছোটদের শিক্ষাদান—এ যেন মানুষের জন্মগত অভ্যাস। মানুষ যখন পরিবার গঠন করেছিল তখন মুখে ভাষা না আসা সত্ত্বেও বাবা-মারা আপন সন্তানসন্ততিকে ভবিষ্যতের চলার পথের সন্ধান দিয়ে যেতো। এই পদ্ধতি বহু জীবজন্তুর মধ্যেও দেখা যায়। বাঘ, সিংহ, ভালুক, বেড়াল প্রভৃতির মা'রা সন্তানকে শিকার ধরার কায়দা বেশ ভালভাবেই শিখিয়ে দেয় এবং তারা মায়ের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেই স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে।

মানুষ যখন দলবদ্ধ হয়ে বাস করছিল, তখন ছোটদের শিক্ষা-দানের ব্যাপারটা গ্রহণ করেছিল বয়স্করা। সেদিন অবশ্য শিক্ষাদানের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। সকালে দলের অধিকাংশ ব্যক্তিই গুহা ছেড়ে খাদ্যের অন্বেষণে বেরিয়ে যেতো, আর পড়ে থাকতো বৃদ্ধরা এবং শিশুরা। তখন তাদের মুখে ভাষা কতখানি এসেছিল, তা বলা

যায় না। তবে যেমন করেই হোক না কেন, শিশুরা জীবনযুদ্ধে যাতে জয়ী হতে পারে তার জন্য বয়স্করা বর্ণনা করতো তাদের সারা জীবনের অভিজ্ঞতার কথা, নানা ধরনের অস্ত্র তৈরির রহস্য এবং বন্যজন্তুদের বিভীষিকা ও তাদের আচরণের কথা। প্রয়োজন হলে গুহাগাত্রে বন্যপশুদের ছবি এঁকেও ছোটদের পরিচয় করিয়ে দিতো। দলবদ্ধ হয়ে যে সময় যাযাবর জীবন-যাপন করেছিল তখনও চলেছিল ঠিক ঐ একই ব্যবস্থা এবং এর প্রত্যক্ষফল চিত্র থেকে চিত্রলিপির উদ্ভব।

লিপির মাধ্যমে মনের ভাবকে ব্যক্ত করতে অবশ্য অনেক সময় লেগেছিল মানুষের। তবে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে জোরদার করে মানুষ। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিদ্যালয়। সে সময়টাতে ছাত্রদের বড্ড বেশি শ্রম করতে হতো। গুরুদের মুখ থেকে শুনে মনে একেবারে গেঁথে ফেলতে হতো। লেখার পদ্ধতির উন্নতি না হওয়াই ছিল এর একমাত্র কারণ।

ঐ সময়টা আবার নগরসভ্যতার যুগ। আর সেই কুক্ষণে মানব-সমাজে প্রচলিত হয়েছিল ক্রীতদাস ব্যবস্থা, ভূমিদাস ব্যবস্থা এবং উচ্চ-নিচ ভেদাভেদ। তাই শিক্ষার পথ এইসময় থেকে সঙ্কুচিত হলো। সমাজের প্রভাবশালীদের ছেলেরা পড়াশোনা করতে পারলো, আর সাধারণের সন্তানরা হলো উপেক্ষিত। আর শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করলেন পুরোহিতেরা।

একমাত্র গ্রীক আমল ছাড়া শিক্ষার সঙ্কোচনীতি পাশ্চাত্যে মধ্য-যুগের শেষভাগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল বলা যায়। ভারতবর্ষে প্রথম প্রথম এই ব্যবস্থা থাকলেও বৌদ্ধযুগে শিক্ষার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত হয়। এমনকি বিদেশীদের জন্যও। বহুমুখী ও সুবৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গঠনও করেছিল প্রথম ভারতবর্ষই। বিভিন্ন স্থানের নগরসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে ছোট ছোট বিদ্যালয়ের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, গ্রীকরাও গড়েছিলেন বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় দুইই। প্লেটো একাদেমি এবং আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গ্রীকদের মহান অবদান। কিন্তু এদেরও পুর্বে ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছিল তক্ষশিলা, নালন্দা,

বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়। কারও কারও মতে তক্ষশিলা বৌদ্ধযুগের আগেই স্থাপিত হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত পানিনি তক্ষশিলায় জ্ঞানলাভ করেছিলেন। বুদ্ধশিষ্য জীবক ও চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্যও তক্ষশিলার ছাত্র ছিলেন। এঁরা যথাক্রমে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আশ্চর্যের কথা, সেকালেও এখানে পড়ানো হতো দর্শন, সাহিত্য, ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদ, জ্যোতির্বিজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা, রাজনীতি, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, নৃত্যকলা প্রভৃতি অধিকাংশ বিষয়।

বর্তমানে ছোটদের শিক্ষায় মনোযোগী করে তুলতে এবং সব শিশুকে শিক্ষাদানের আওতায় আনতে বহুচিন্তাবিদ নানারকম উপায় উদ্ভাবন করেছেন। এমন কি মুক ও বধিরদের জন্যও শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। এগুলির শুরু খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে এবং পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিদরাই প্রথম এই ধরনের চিন্তাভাবনার সূত্রপাত করেছিলেন। সেই সব চিন্তাবিদদের মধ্যে ডেনমার্কের ডেসিডেরিয়াস ইরেসমাস, চেকোস্লোভাকিয়ার জন অ্যামস কোমেনস্কি, সুইজারল্যাণ্ডের জোহান হাইনরিখ পেস্তালৎসি, জার্মানীর ফ্রেডরিক ফ্রবেলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আজকের শিশুদের জন্য কিণ্ডারগার্টেন নামে যে শিক্ষাপদ্ধতি পৃথিবীর প্রায় সব দেশে চালু হয়েছে তার প্রবর্তক ফ্রেডরিক ফ্রবেল। জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের জন্য শিক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কার করে অমর হয়ে আছেন ডাঃ মারিয়া মন্তেসরি এবং অন্ধদের আক্ষরিক জ্ঞানলাভের উপায় উদ্ভাবন করেছেন লুই ব্রেইল। আবিষ্কর্তার নামানুসারে পদ্ধতিটির নামকরণ হয়েছে ব্রেইল পদ্ধতি। ঐ পদ্ধতিতে লেখাপড়া শিখে জগদ্‌বিখ্যাত হয়েছিলেন আমেরিকার অন্ধ, মুক ও বধির এক মহিলা। নাম তাঁর হেলেন কেলার। তিনি বি. এ. পাশ করে অধ্যাপিকা হয়েছিলেন এবং অনেকগুলি বইও লিখে গেছেন।

করমর্দন

রাস্তায় কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে তোমরা তার দিকে তোমাদের ডানহাতটা বাড়িয়ে দাও। তারপর বন্ধুর ডানহাতের চেটোটা নিজের ডানহাতের চেটোয় পুরে নাড়া দাও। প্রীতির মনোভাব প্রকাশ করতে এই আচরণকে তোমরা বল হ্যাণ্ডসেক বা করমর্দন।

এই রীতিটি কিন্তু পাশ্চাত্যের। তবে কবে থেকে যে এই রীতি চালু হয়েছে তা বলা যায় না। অপরদিকে বিষয়টা নিতান্ত তুচ্ছ হলে কি হবে, এ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা কিন্তু অনেক ভেবেছেন। কেন এ নিয়ম মানবসমাজে প্রবর্তিত হলো, কেমন করে হলো, ইত্যাদি যেমন তোমাদের প্রশ্ন তেমনই পণ্ডিতেরাও ভেবেছেন এই প্রশ্নগুলিকে নিয়ে। সিদ্ধান্তে এসেছেন, মানুষের ডান হাতটাই ছিল ক্ষমতার প্রতীক। ঐ হাত দিয়েই তারা অস্ত্রধারণ করতো, শত্রুর মোকাবিলা করতো, বন্যপ্রাণীকে হত্যাও করতো। তাই সেই আদিকালেও কেউ কারও দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলে শুভ ইচ্ছার প্রতীকরূপে গণ্য হতো। যেহেতু নিরস্ত্র হাত, তাই যুদ্ধ কিংবা শত্রুতাকে বোঝাতো না।

এই নিয়ম কিন্তু প্রাচীনকালের সবদেশের যোদ্ধারাই মেনে চলতেন। যত বড় শত্রুই হোক না কেন নিরস্ত্র থাকলে তার উপর কদাচ অস্ত্রাঘাত করা হতো না। একপক্ষ অস্ত্রে সজ্জিত এবং অপর-পক্ষ নিরস্ত্র থাকলে অস্ত্র পরিত্যাগ করে দ্বন্দ্ব যুদ্ধই করতো। অপর-পক্ষে নিরস্ত্র শত্রু যদি অস্ত্রে সজ্জিত শত্রুর দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিতো তাহলে যতবড় শত্রুতা থাক না কেন সাময়িকভাবে বন্ধু বলে গণ্য করে নিতো। তারপর অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে দেখা করতো যুদ্ধক্ষেত্রে। কী সুমহান আদর্শ, তাই না? এত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, এত শিক্ষালাভ করেও সে আদর্শকে মানুষ রক্ষা করতে পারেনি।

অতি পুরাতন এই রীতি সম্ভবত গ্রীক আমলে অপরের বন্ধুত্ব

প্রার্থনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিল। ক্ষমতার প্রতীক মানুষের হাতদুটোকে বিশেষ বিশেষ মনোভাব প্রকাশ করতেও ব্যবহার করতেন গ্রীকরা। ডান হাতকে মুষ্টিবদ্ধ করলে বোঝাতো শত্রুতা, দুহাত উপরের দিকে তুললে বোঝাতো আত্মসমর্পণ, দুহাত সামনে প্রসারিত করে চেটোগুলোকে পেতে ধরলে বোঝাতো করুণা ভিক্ষা, ইত্যাদি। এগুলো এখনও যে সম্পূর্ণ অপ্রচলিত এমনও নয়।

গ্রীক আমলে দুর্বল ব্যক্তিরা সকলের সাহায্যও প্রার্থনা করতো ডান হাতকে আপন হাতের মুঠোয় পুরে। দীর্ঘকাল অনুরূপ ব্যবস্থাগুলি চলে আসার ফলে পরের দিকে মনে হয় পাশ্চাত্যে এটি একটি সামাজিক প্রথা হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে সেই প্রথার আরও একটু উন্নতি হয়েছে। অর্থাৎ নিবিড় বন্ধুত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে নাড়া দেওয়ারও ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে।

ডান হাতকে ক্ষমতার প্রতীকরূপে আদিমানুষ যে ব্যবহার করতো, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সব দেশে এবং সব ধর্মের মানুষই হাতকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে আনুগত্য, কল্যাণ কামনা, বন্ধুত্বসম্পন্ন ইত্যাদি সঙ্কেত প্রদান করে থাকেন। হাতজোড় করাকে শক্তি প্রকাশের পরিবর্তে শক্তির সংকোচন বলে মনে করা যেতে পারে। এটিও বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রতীক বলে আমরা ধরে নিতে পারি—যা আমাদের সামনে বহুল প্রচলিত।

ক্যালেণ্ডার বা বর্ষপঞ্জী

"পুরাতন বৎসরের জীর্ণ-ক্লান্ত দিনগুলো" অবসানের প্রাক্কালেই নতুন বছরের ক্যালেণ্ডার সংগ্রহ করার জন্য তোমাদের কতই না আগ্রহ। উদ্দেশ্য আমাদের উৎসব-অনুষ্ঠান, ছুটিছাটা ইত্যাদি সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে অবহিত হওয়া। সত্য বলতে কী, আজকের কর্মব্যস্তাতার দিনে দিন-তারিখের হিসেব করতে এবং প্রতিদিনের কর্মসূচী তৈরি করতে ক্যালেণ্ডার না হলে চলেই না।

এমন যে অত্যাবশ্যক জিনিসটি—এটিরও আবিষ্কার সম্বন্ধে তোমাদের মনে নানা ধরনের প্রশ্ন। আর এই আবিষ্কারটিরও অন্যান্য আবিষ্কারের মত একটা ইতিহাস আছে এবং যুগে যুগে বহু প্রতিভাও নিয়োজিত হয়েছে এর পেছনে।

বছর গণনার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল মানব সভ্যতার সেই আদি পর্বেই। তবে প্রস্তরযুগে নয়, তাম্রযুগে নগর সভ্যতার পত্তনের যুগেই শুরু হয় বছর গণনার কাজ।

সে যুগে মানুষের হাতে কোন যন্ত্রপাতি ছিল না, ছিল না হিসেব করার সূক্ষ্ম পদ্ধতি। অপরদিকে সেকালে মানুষের ধারণা ছিল না যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। বড় বড় চিন্তাবিদরাও মনে করতেন, পৃথিবী স্থিরভাবে অবস্থান করছে এবং সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রাদি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে পরিক্রমা করছে। তাই সেকালে যা কিছু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে—সবই ভূয়োদর্শনের ফলে।

প্রথমে মিশরীয়রা মনে হয় বর্ষ গণনা শুরু করেছিল নীলনদের বন্যাকে দেখে। বছরের একটা বিশেষ সময়ে নীলনদে বন্যা আসতো আর ঐ সময়টাকে মনে করতো বর্ষারম্ভ। পরের দিকে ওরাই আকাশে রাশিচক্র এবং নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান অনুযায়ী বর্ষ গণনা শুরু করে। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় এক হাজার কিংবা দেড় হাজার বছর আগে অনুরূপ উপায় আবিষ্কৃত হয়েছিল বলে অনেকের বিশ্বাস।

ক্যালেণ্ডার বলতে আমরা যা বুঝি, সেটির আবিষ্কার হয়েছে খ্রীষ্টজন্মের মাত্র কিছুকাল আগে—রোমান আমলে। রোম সেদিন সভ্যতার চরম শীর্ষে আরোহণ করেছিল এবং প্রচলিত বহু পদ্ধতির সংস্কারও করেছিল। সেই পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে বর্ষপঞ্জীর তালিকা প্রস্তুত প্রণালী।

রোমান পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করেছিলেন, আকাশের রাশিগুলি বছরের সব সময় একটি নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করে না। আজ আকাশের যে জায়গায় যে রাশিটিকে দেখা যায়, পুনরায় সেই জায়গায় সেই রাশিটিকে দেখতে হলে ৩৬৫ দিন অপেক্ষা করতে হয়। কিংবা সূর্য আজ যে রাশিতে অবস্থান করছে পুনরায় সেই রাশিতে আসতে সময় লাগে ৩৬৫ দিন। তাই তাঁরা ৩৬৫ দিনে এক বছর ধরতেন এবং বর্ষারম্ভ ধরতেন আজকের ২৫শে মার্চকে।

২৫ শে মার্চকে বর্ষারম্ভ ধরার পেছনে একটা যুক্তিও ছিল। তাঁরা মনে করতেন ঐ ২৫ শে মার্চ দিনটিতে পৃথিবীর দিন রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান সমান। আর ঐ দিনটিকে তাঁরা সেকালেই ধরে নিয়েছিলেন এটি বাসন্ত বিষুব বা মহাবিষুব। যদিও বর্তমানে বিজ্ঞানীদের হিসেবে বাসন্ত বিষুব পড়ে ২১ শে মার্চ তারিখে।

এখানে আরও উল্লেখ করতে হয় যে, কেবলমাত্র ২১ শে মার্চ নয়, ২২ শে সেপ্টেম্বর তারিখেও দিন রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান সমান। ঐ দিনটিকে শারদ বিষুব বা জল বিষুব নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। রোমানরা শারদ বিষুব সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন কিনা ঠিক ঠিক বলা যায় না। তবে বাসন্ত বিষুব থেকে বর্ষ গণনা শুরু করায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে সে হিসেবটা স্থূল হওয়ার জন্য পরবর্তীকালে যথেষ্ট গোলমালের সম্মুখীন হয়েছিলেন। অর্থাৎ কয়েক-বছর পরেই তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, রাশিপুঞ্জ নির্দিষ্ট দিনে আকাশের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করছে না এবং ২৫ শে মার্চ তারিখে দিনরাত্রিও সমান হচ্ছে না। উক্ত ত্রুটি নিবারণের জন্য গবেষণা অবশ্য হয়েছিল কিন্তু ভাল ফল কিছু লাভ হয়নি বলা যায়।

প্রাচীন ঐ ত্রুটিযুক্ত পদ্ধতিই চলে আসছিল দীর্ঘকাল। একদিন দিগ্বিজয়ী বীর জুলিয়াস সিজারের সময় এলো। ভুল বর্ষ গণনা হচ্ছে বুঝতে পেরে বেজায় ক্ষুণ্ণ হলেন। মনস্থ করলেন, সঠিক বছর গণনার মাধ্যমে নিজের রাজত্বকালকে চিহ্নিত করে যাবেন। হয়ত এই উদ্দেশ্যে বছরের দিনসংখ্যা সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন বেশ কিছু সংখ্যক পণ্ডিতকে। অতঃপর পণ্ডিতেরা বেশ কয়েক বছর ধরে আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। অবশেষে সিদ্ধান্তে আসেন, বছরের দিনসংখ্যা ৩৬৫ নয় ৩৬৫$\frac{১}{৪}$।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫ অব্দে পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জুলিয়াস সিজার প্রথম প্রচলন করলেন বিজ্ঞানসম্মত একটি বর্ষপঞ্জী। তিনিই প্রথম বর্ষারম্ভ ধরেন ১লা জানুয়ারীকে। ঐ দিনটিকে বর্ষারম্ভ ধরার পেছনে অবশ্য কোন যুক্তি ছিল না। উক্ত মাসটি স্বর্গের দেবতা জেনাসের নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছিল বলে পবিত্র মাস রূপে সিজার মনে করতেন। এবং তাঁরই খেয়ালকে প্রাধান্য দান করা হয়েছিল।

সিজারের নির্দেশে বছরকে চারটি ভাগে ভাগ করেছিলেন পণ্ডিতেরা। প্রথম ভাগে নির্দিষ্ট রেখেছিলেন ৯০ দিন, কিন্তু চতুর্থ বৎসরটায় হবে ৯১ দিন। দ্বিতীয় ভাগে দিন সংখ্যা ৯১, তৃতীয় ভাগে ৯২ এবং চতুর্থ ভাগে ৯২ দিন নির্দিষ্ট হয়েছিল।

প্রথম ভাগের দিন সংখ্যাকে চতুর্থ বৎসরে ৯১ করার উদ্দেশ্য ছিল, ৩৬৫ দিন হিসাবে বছর গণনা করলে প্রতি বছর $\frac{১}{৪}$ দিন অতিরিক্ত হয়। চার বছরে অতিরিক্ত হয় ($\frac{১}{৪}\times$৪) এক দিন। তাই সেই থেকেই চতুর্থ বছরকে ৩৬৬ দিন ধরার নিয়ম প্রযুক্ত হয় এবং ঐ বছরকে লিপইয়ার রূপে গণ্য করা হয়। সাধারণত ফেব্রুয়ারী মাসকে ২৮ দিন এবং চতুর্থ বছরে ২৯ দিন ধরার প্রস্তাব করেছিলেন সিজার। আর সেই নিয়ম এখনও চলে আসছে।

সিজারের তিরোধানের প্রায় সাড়ে পাঁচশ' বছর পরে ধর্মগুরু পোপ নতুনভাবে বর্ষ গণনা করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং পূর্বের সেই ২৫ শে

মার্চ বর্ষারম্ভ বলে চালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সফল হতে পারেননি তিনি।

এরপর আরও প্রায় হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে বর্ষপঞ্জী সম্বন্ধে বিশেষ কেউ অসন্তোষ প্রকাশ করেননি বা বছরের দিনসংখ্যা প্রকৃত কত হওয়া উচিত সে নিয়েও কেউ চিন্তা-ভাবনা করেননি। সিজার প্রবর্তিত সেই একই নীতি অনুসরণ করা হচ্ছিল। এ বিষয়ে পুনরায় সন্দেহ প্রকাশ করেন ধর্মগুরু ত্রয়োদশ গ্রেগরী। তিনি বছরের দিনসংখ্যা সূক্ষ্মভাবে গণনা করে দেখলেন, বছরটা ৩৬৫ দিনেও নয় ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিনেও নয়। দিন সংখ্যা হবে ৩৬৫·২৪২২ দিন। পূর্ববর্তী হিসেবের সঙ্গে সমতা আনতে গিয়ে দেখলেন, সিজারের আমল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় দশদিনের মত বেশি ধরা হয়ে গেছে। তাই তিনি ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর শুক্রবার দিনটিকে এগিয়ে এনে ১৫ই অক্টোবরে পরিণত করেন। মজার কাণ্ড একটা ঘটে গেল। অর্থাৎ পূর্ব দিন যে শিশুর বয়স ছিল মাত্র ১ দিন, পরদিন তার বয়স হয়ে গেল ১১ দিন।

ভবিষ্যতে এ ভুল যাতে না হয় তার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন গ্রেগরী। তিনি হিসেব করে দেখলেন, সিজার প্রবর্তিত ক্যালেণ্ডারকে ঠিক রাখতে হলে প্রতি হাজার বছরে ৭·৮ অথবা ১২৮ বছরে প্রায় ১ দিন কমাতে হবে। তাই লিপইয়ারের জন্য নতুন একটা নিয়ম প্রয়োগ করলেন। সেই নিয়ম অনুযায়ী ৪ বছরে লিপইয়ার ধরা হলেও প্রতি ৪০০ বছরে ১০০টির পরিবর্তে ৯৭টি লিপইয়ার ধরতে হবে। প্রস্তাব রাখলেন, শততম মাসগুলি ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য না হলে তাকে লিপইয়ার রূপে গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী ১৭০০, ১৮০০, ১৯০০, ২১০০ প্রভৃতি সালগুলি ৪ দ্বারা বিভাজ্য হলেও ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য না হওয়ায় লিপইয়ার হবে না।

পোপ গ্রেগরীর বর্ষপঞ্জীকে এখনও অনুসরণ করা হচ্ছে। আধুনিক গণনায় ধরা পড়েছে, গ্রেগরীর গণনাও অভ্রান্ত নয়। অতি সামান্য হলেও ত্রুটি আছে। যদিও সে ত্রুটিটা অতি নগণ্য, তবুও মহাকালের

দরবারে যে ত্রুটি ভবিষ্যতে একদিন বিরাট আকারে দেখা দেবে। তাই সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত ক্যালেণ্ডার প্রচলন করতে পৃথিবীর সবদেশই প্রয়াসী। এই উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বহু দেশের বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানী নানা-ধরনের প্রস্তাব রেখেছেন। কিন্তু সর্বসম্মতভাবে কোন প্রস্তাবই গৃহীত হয়নি। তাই বলে সেই ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দের মত একটা মজার ঘটনা যে কোনদিন ঘটবে না এমন নয়।

দমকল

দমকলের নাম তোমরা সবাই শুনেছো। সাধারণতঃ বড় বড় শহরে পুলিশের তত্ত্বাবধানে দমকল বাহিনী থাকে। কোথাও অগ্নিকাণ্ড ঘটলে এবং সেই আগুনকে আয়ত্তে আনতে না পারলে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ তখন অগ্নিনির্বাপনের জন্য দমকল বাহিনীকে তলব করে। দমকল বাহিনী এক বা একাধিক গাড়ি সজ্জিত করে এবং অল্পসময়ের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌছে যায়। তাদের গাড়িতে বাঁধা থাকে বিরাট একটা ঘন্টা। ঘন্টাধ্বনি শ্রবণ মাত্রই রাস্তার যানবাহনগুলি একপাশে সরে গিয়ে তাদের রাস্তা ছেড়ে দেয়।

বর্তমানে দমকল বাহিনী ইঞ্জিনের সাহায্যে নিকটস্থ পুকুর বা নদী থেকে জল নিয়ে আগুনের উপর-ঢালে এবং আগুনকে আয়ত্তে আনে। আর সবসময় কিছু না কিছু জল ওরা গাড়িতে জমাও রাখে। আর রাখে বড় বড় মই বা টার্নটেবল ল্যাডার। বহুতল বিশিষ্ট পাকাঘরের আগুন নেভাতে ঐ মটর ব্যবস্থা।

দমকলের ইতিহাস কিন্তু অতি প্রাচীন। কথিত আছে, খ্রীষ্টজন্মের প্রায় হাজার বছর আগে মিশর দেশই প্রথম দমকল বাহিনী গঠন করেছিল। তখন কিন্তু আগুন নেভানোর জন্য পাম্পমেসিন বা গাড়ির ব্যবস্থা ছিল না। কতগুলো লোক বিশেষ ধরনের বালতির আকারের ধাতব পাত্রে জল এনে আগুনের উপর ঢালতো। তখন ধূলাবালি ব্যবহারেরও প্রচলন ছিল।

কারও কারও মতে ওর উপযোগিতা উপলব্ধি করে গ্রীকরাও দমকল বাহিনী নিযুক্ত করেছিল। তবে সুসজ্জিত দমকল বাহিনী গঠিত হয়েছিল রোমসম্রাটদের আমলে। রোমানদের পরিবহনের জন্য ঘোড়া ছিল, একাধিক বাহিনী ছিল এবং এক একটি বাহিনীতে লোকসংখ্যাও ছিল প্রচুর। তবে এরাও আগুন নেভাতে জল ছাড়া ধূলাবালিও ব্যবহার করতো।

রোমসাম্রাজ্যের পতনের পর প্রায় দেড় হাজার বছরকাল কোন দেশ দমকল বাহিনী গঠন করেনি বলে মনে হয়। আধুনিকালে দমকলবাহিনী প্রথম গড়ে উঠেছিল লণ্ডনে। কথিত আছে, ১৬৬৬-খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন শহরে এক অতি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল। তখনই সচেতন হয়েছিল তারা এবং দমকলের উপযোগিতা উপলব্ধি করেছিল। ভবিষ্যতে যাতে এইধরণের ঘটনা ঘটলে সহজে আয়ত্তে আনা যায় তার জন্যই গড়েছিল একটা দমকল বাহিনী।



আগুন নেভাচ্ছে দমকল বাহিনী

সেদিন লণ্ডন যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তা ছিল গ্রীক কিংবা রোমানদের অনুরূপ। আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত সুসংগঠিত দমকল বাহিনী লণ্ডনে গঠিত হয়েছে উপরোক্ত ঘটনার প্রায় একশ বছর পরে। এবং এটি সম্ভব হয়েছে বাষ্পশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইঞ্জিন উদ্ভাবনের পরে। গাড়ির প্রচলন হওয়ায় ঘোড়াকে পরিত্যাগ করা হয়।

লণ্ডনে দমকল বাহিনী গঠিত হওয়ার পরে অপরাপর দেশ দমকলের গুরুত্ব অনুভব করে এবং লণ্ডনের অনুরূপ দমকল বাহিনী গঠন

করতে থাকে। পরিশেষে পেট্রোল ইঞ্জিন আবিষ্কার হলে দমকলের আরও উন্নতি হয়।

এশিয়া মহাদেশে প্রথম দমকল বাহিনী গঠিত হয়েছিল শহর কলিকাতাতেই। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কলিকাতাই ছিল তাদের প্রধান কার্যালয়। এখানে ওখানে ব্যাঙের ছাতার মত কলকারখানা, দোকানপাট, অফিস-আদালত ইত্যাদি বিস্তার হতে থাকায় মাঝে মাঝে অসাবধানতাবশতঃ ছোটবড় অগ্নিকাণ্ড ঘটতো। ফলে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ আগুনের হাত থেকে খাতাপত্র ও অন্যান্য সামগ্রীকে রক্ষা করতে লণ্ডনের অনুরূপ দমকল বাহিনী নিযুক্ত করেছিল ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে। সেই থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দমকলের একমাত্র কেন্দ্র ছিল লালবাজার। পরে দমকল বাহিনীর সংখ্যা বাড়ানো হয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে পাশ্চাত্য থেকে উন্নতমানের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের আমদানি করা হয়।

এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, ছোট ছোট অগ্নিকাণ্ডকে আয়ত্তে আনতে আজকাল এক ধরনের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। যন্ত্রটিকে অনেক সময় বড় বড় সভাকক্ষে, সিনেমাহলে, ডাক্তারখানায়, সরকারী অফিসগুলিতে এবং কোন কোন কারখানার দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখতে দেখা যায়। দ্রুত কারবন-ডাই-অক্সাইড উৎপাদন এবং ঐ গ্যাসের সাহায্য আগুন নেভানোর যান্ত্রিক সরঞ্জাম এটি।

যন্ত্রটি অনেকটি শঙ্কু আকৃতির। আগাগোড়া শক্ত ধাতব পাত দিয়ে তৈরি। অভ্যন্তরে থাকে দুটি কাঁচনল। তাদের একটিতে থাকে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড এবং অপরটিতে থাকে সোডিয়াম কারবোনেট দ্রবণ। যন্ত্রের ঊর্ধ্বাংশে থাকে একটি হাতল এবং নিম্নাংশে একটি সরু ছিদ্র। হাতলে জোরে আঘাত করলে সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের কাঁচনল দুটো ভেঙ্গে যায় এবং অ্যাসিড ও সোডার দ্রবণ মিশ্রিত হয়ে বিক্রিয়া ঘটানোর সুযোগ পায়। বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় পর্যাপ্ত কারবন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং এই গ্যাস তলার ছিদ্র দিয়ে

প্রবলভাবে বেরিয়ে আসতে থাকে। ঐ ছিদ্রটাকে প্রজ্জ্বলিত কোন জিনিসের উপর ধরলে কারবন-ডাই-অক্সাইড এবং বিক্রিয়ায় উৎপন্ন জল ছিদ্রপথে বেরিয়ে এসে আগুনকে নেভায়।

তেল কিংবা পেট্রোলের আগুনকে নেভাতে যে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাতে থাকে ফটকিরি ও সোডিয়াম বাই-কারবনেট। ওদের ক্রিয়ায় কেবল কারবন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়, কিন্তু জল উৎপন্ন হয় না।

সভ্যতার একেবারে উষালগ্নে কোন কিছুর দৈর্ঘ্যকে মাপার জন্য মানুষ সচেষ্ট যে হয়েছিল তার নমুনা প্রচুর পাওয়া গেছে। প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ গুলি থেকে পাওয়া গেছে একাধিক মাপনী দণ্ড। তবে সেই আদিকালে মানুষ দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য কোন্ ব্যবস্থা যে গ্রহণ করেছিল--তা সঠিকভাবে বলার কোন উপায় নেই। শুধু একটুকু বলা যায়, সেকালে বিভিন্ন সভ্যতা নিজেদের খেয়ালখুশি অনুযায়ী এক একটি একক স্থির করেছিল। একের সঙ্গে অপর সভ্যতার মিল বিশেষ ছিল না।

প্রথমে ভারতবর্ষের কথা ধরা যেতে পারে। সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে বেশ কয়েকটা মাপনি দণ্ড। পরের দিকে অর্থাৎ বৈদিক যুগে একদিকে যেমন ক্রোশ, যোজন প্রভৃতি বড় এককের প্রচলন হয়েছিল অপরদিকে তেমনই ছোট একক যবেরও প্রচলন ছিল। পথের দূরত্ব নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হতো ক্রোশ এককটি। কথিত আছে, কোন একজন ব্যক্তি একজায়গায় দাঁড়িয়ে জোরে ডাক দিলে যতদূর পর্যন্ত তার ডাক পৌছতো—সেই দূরত্বটাই ছিল ক্রোশ। অপরদিকে ক্রোশের চেয়ে বড় একক যোজন নির্ণয় করা হতো একটা ঘোড়া একটানা যতটা পথ অতিক্রম করতে পারে—ঠিক ততটা পথ।

ছোট একক একটি যবের পরিমাণ বা যব। যবের পর হাতের আঙ্গুলের মাপ, আঙ্গুলের চেয়ে বড় একক "হাত"—অর্থাৎ কনুই থেকে মাঝের আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত, তারপর দু'হাতকে বিস্তৃত করলে যতটা হয় তাকে বলা হতো বাঁও। অবশ্য এই "বাঁও" এককটি অন্যান্য দেশেও প্রচলিত ছিল এবং প্রচলিত ছিল 'হাত' এককটিও।

প্রাচীনকালে রোমানরা দৈর্ঘ্যের বেশ কয়েকটি একক ব্যবহার করতেন। তাদের সবচেয়ে ছোট এককটি ছিল ভারতের মত 'যব'

তথা একটি যবের পরিমাপ। পরপর তিনটি যব পাশাপাশি রাখলে যে দূরত্বটা হয় তাকেই ধরতো ইঞ্চি হিসেবে। ইঞ্চির বড় একক কী ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না।

মধ্যযুগেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। কোন দেশে পায়ের পাতার মাপ, কোন দেশে হাতের মাপ আবার কোন দেশ একটি মানুষের পুরো মাপকে দৈর্ঘ্যের একক ধরতো। এতে গোলমাল হতো প্রচুর। কারণ, সব মানুষের দৈর্ঘ্য সমান নয়। কেউ বেঁটে, কেউ অপেক্ষাকৃত লম্বা, অতএব হাত বা পায়ের পাতার মাপ সমান হবে কেমন করে?

উপরোক্ত অসুবিধার জন্য রাজরাজড়ারাও মাথা ঘামাতে শুরু করেন। সবার হাত পায়ের মাপ সমান না হওয়ায় এবং দৈর্ঘ্য কম বেশি হওয়ায় অনেকে মনে হয় বিরক্তও হতেন। কথিত আছে, ইংলণ্ডের রাজা প্রথম হেনরি একটি সার্বজনীন দৈর্ঘ্যের একক হিসেবে গজের প্রচলন করেন। তাঁরই নির্দেশে তাঁর নাকের ডগা থেকে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল পর্যন্ত মেপে একটি ফিতে তৈরি করা হয়েছিল। এবং ঐ ফিতেটির মাপকে বলা হয়েছিল এক ইয়ার্ড বা গজ।

ইংলণ্ডে ঐ গজের প্রচলন দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। মহারাণী প্রথম এলিজাবেথ এটির পুনরায় সংস্কার করেন। তিনি প্রথম হেনরীর মাপকে বাতিল করে দিয়ে নতুন একটি পন্থা বার করেন। তাঁর নির্দেশে ষোলজন লোককে একজনের পেছনে আর একজন এইভাবে দাঁড় করানো হয়। তারা এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, যাতে একজনের দুটি পায়ের পাতা পেছনের লোকটির পায়ের পাতা দুটি আলতো ভাবে দুটি সারিতে ছুঁয়ে থাকে। অর্থাৎ পরপর ষোলটি পায়ের পাতা দুটি সারিতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাকা অবস্থায় দৈর্ঘ্যটা মাপা হয়েছিল। ঐ দৈর্ঘ্যটার নাম দেওয়া হয়েছিল রড এবং রডের ষোলভাগের একভাগ এক ফুট।

দৈর্ঘ্য মাপার উক্ত পদ্ধতিটিও ইংলণ্ডে দীর্ঘকাল চলেছিল এবং চলেছিল ইংরাজদের উপনিবেশগুলিতে। কিন্তু বিজ্ঞানের যুগে এই

ধরনের পদ্ধতিকে কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না পণ্ডিতেরা। তাঁরা চাইলেন, পৃথিবীর সর্বত্র একটা নিখুঁত এবং বিজ্ঞানসম্মত মাপের প্রচলন করতে। ফলে মাথা ঘামাতে শুরু করেন পৃথিবীর প্রায় সব দেশের বিজ্ঞানীরা।

অবশেষে ফ্রান্সের কয়েকজন বিজ্ঞানী মিটারকে দৈর্ঘ্যের একক হিসাবে গ্রহণ করতে প্রস্তাব পেশ করেন এবং এক মিটারের দৈর্ঘ্য কতটা হবে সে বিষয়ে তাঁরা উল্লেখ করেন, পৃথিবীর পরিধির চার কোটি ভাগের এক ভাগকে মিটার রূপে চিহ্নিত করতে হবে।

বিজ্ঞানীরা সম্মত হলেন। তবে পৃথিবীর সঠিক পরিধিটা নির্ণয় না হওয়ায় একটু অসুবিধায় পড়লেন। কিন্তু সে অসুবিধাকেও কাটিয়ে উঠলেন তাঁরা। একদিন সূক্ষ্মভাবেই নির্ণয় করে নিলেন পৃথিবীর পরিধি। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে জুন পৃথিবীর পরিধির চার কোটি ভাগের একভাগ যত হয় তারই মাপের একটি প্লাটিনাম দণ্ড প্রস্তুত হলো। সে দণ্ডটি আজও রেখেছে ফ্রান্স।

তারপর ঐ মিটারকে হাজার ভাগে ভাগ করা হলো ক্ষুদ্র একক হিসাবে এবং হাজার গুণে বড় একক হলো বৃহত্তম একক। তোমাদের অবশ্য বর্তমানে ছোট বড় সব এককের সঙ্গে পরিচয় আছে।

প্লানেটেরিয়াম বা আকাশঘর সম্বন্ধে তোমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা আছে। একটি বিশেষ ধরনের কক্ষে মহাকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায় বলে ওর এই ধরনের নামকরণ। তোমরা অনেকেই দেখেছো কলিকাতার বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামটি। গম্বুজাকৃতি। দূর থেকে যেমন চমৎকার দেখায়, ভেতরটাও তেমনই। একদিকে অবসর বিনোদন, অপরদিকে মাহাকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ—দুইই তোমরা লাভ করে থাকো।

পৃথিবীর সব প্লানেটেরিয়ামের চেহারা ঐ একই। তবে ওর মধ্যে যে মহাকাশকে প্রত্যক্ষ করা হয়, সেটি কিন্তু আসল মহাকাশ নয়। মহাকাশকে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। যে যন্ত্রটির দ্বারা ঐ আশ্চর্যজনক কাজটি সম্পন্ন করা হয় সেটির নাম প্রক্ষেপক যন্ত্র বা অপটিক্যাল প্রোজেক্টর। যন্ত্রটি ভয়ানক শক্তিশালী এবং কারিগরি বিদ্যার এক অপূর্ব নিদর্শন।

অপটিক্যাল প্রোজেক্টরের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর দ্বারা ছোট বড় হরেক রকমের আলোকবিন্দুকে প্রক্ষেপ করা যায়। গোলাকার ছাদে অন্ধকারে সঠিক দূরত্বে নক্ষত্র কিংবা গ্রহ-উপগ্রহের অনুরূপ আলোকবিন্দুগুলোকে প্রক্ষেপ করলে আমাদের চোখের সামনে মহাকাশের পুরো ছবিটাই ফুটে ওঠে। যদিও আলোকবিন্দুগুলোকে পরপর সাজিয়ে প্রক্ষেপ করার মধ্যে কৃতিত্ব রয়েছে যথেষ্ট।

বিদ্যুৎচালিত প্রক্ষেপ যন্ত্রের সাহায্যে ছবিকে গতিশীলও করা যায়। যার জন্য আমরা গ্রহ-নক্ষত্রদের সঠিক গতিবিধিও বুঝতে পারা যায়। অপরদিকে আলোকবিন্দুগুলোকে যথোপযুক্তভাবে প্রক্ষেপের সাহায্যে গ্রহণ, ধূমকেতু প্রভৃতির ছবিও ফুটিয়ে তোলা যায়। আর এমন নিপুণভাবে দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করা হয় যে, দর্শকরা তিলমাত্র বুঝতে পারে না ওটি একেবারেই কৃত্রিম। বোঝা যাবেই বা

কেমন করে ? বাস্তব মহাকাশের সঙ্গে প্ল্যানেটেরিয়াম সৃষ্ট মহাকাশের যে কোন প্রভেদ নেই।

প্রকৃতপক্ষে প্ল্যানেটেরিয়ামকে একটা বিস্ময়ও বলা যেতে পারে। কিন্তু কৃত্রিমভাবে মহাকাশ সৃষ্টির পরিকল্পনা আজকের নয়। এর পেছনে আছে সুদীর্ঘকালের প্রচেষ্টা। কথিত আছে, খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্বে গ্রীক পণ্ডিতেরা নক্ষত্রঘটিত ঐ বিশাল ও বিস্ময়ে ভরা মহাকাশকে কৃত্রিমভাবে রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। সে যুগে অবশ্য মানুষের অন্য ধারণা ছিল। মনে করা হতো, পৃথিবীটা সমতল এবং আকাশটাও সমতল। তাই সমতল কোন প্রস্তরের ফলকে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদিকে খোদাই করতেন। সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা অন্তত মহাকাশের রূপ দিতে পারতেন তাঁরা। মহাকাশের চিত্র-সম্বলিত অনুরূপ প্রস্তরখণ্ড প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে অনেক পাওয়া গেছে এবং সেগুলো কোন না কোন যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

পরের দিকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। পণ্ডিতেরা চিন্তা করেন, পৃথিবী ও আকাশ উভয়েই যদি সমতল হতো তাহলে আকাশ নেমে এসে দূরে পৃথিবীর সঙ্গে মিশে যেতো না। তাই তাঁরা স্থির করেন, পৃথিবীটা সমতল এবং আকাশটা গোলাকার। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতিকে আকাশ পরিক্রমা করতে হচ্ছে। ঐ ধারণার বশবর্তী হয়ে সেদিন রোমের পণ্ডিতমণ্ডলী নির্মাণ করেছিলেন সিলেশ্চিয়াল গ্লোব বা নভোগোলক। উক্ত নভোগোলকের উপরে সূর্য, চন্দ্র, কয়েকটি গ্রহ এবং পরিচিত নক্ষত্রগুচ্ছকে তারা খোদাই করেছিলেন। নিদর্শনও পাওয়া গেছে এবং ঐ নিদর্শনটি পরম যত্নে রক্ষিত আছে রোমে।

নভোগোলকের উন্নতরূপ দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী আর্কিমিদিস। তিনি যে নভোগোলকটি তৈরি করেছিলেন সেটি আগের নভোগোলক অপেক্ষা বেশ বড় ছিল এবং ওতে আকাশের নক্ষত্রগুলির যথাযথরূপ দিয়েছিলেন। উক্ত গোলকে গ্রহ নক্ষত্রাদির উদয়, অস্ত এবং গতি-বিধি ছাড়াও গ্রহদের বিশেষ বিশেষ গতি, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদিকে

দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন আর্কিমিদিস। আরও জানা যায়, নভো-গোলকটিকে তিনি ঘোরাবার ব্যবস্থা রেখেছিলেন এবং গোলকটিকে বিভিন্নভাবে গতিসম্পন্ন করার জন্য জলশক্তিকে ব্যবহার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিম নভোমণ্ডল তৈরি এবং তাকে প্রদর্শনের মূলে আছে আর্কিমিদিসের অবদান। উক্ত কারণে অনেকের মতে প্ল্যানেটেরিয়াম বা আকাশঘরের প্রকৃত রূপকার আর্কিমিদিস।

আর্কিমিদিসের পরও বহু প্রতিভা নিয়োজিত হয়েছিল আকাশ-ঘরের পেছনে। অবশেষে মধ্যযুগে আরবীয় পণ্ডিতরা এক নতুন পরিকল্পনা করেন। নভোগোলক তৈরি না করে ঘরের মধ্যে মহা-কাশের ছবি ফুটিয়ে তুলতে যত্নবান হন। কথিত আছে, দামাস্কাসের একটি গম্বুজাকৃতি প্রাসাদের ছাদে খোদাই করা হয়েছিল মহাকাশের ছবি এবং এই প্রথম ঘরের ভেতরে বসে মানুষ প্রত্যক্ষ করে মহাকাশের রূপকে।

আরবীয় পণ্ডিতদের পরে দীর্ঘকাল ওর বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি বলা চলে। একেবারে আধুনিক যুগেই হয়েছে অভাবনীয় উন্নতি এবং আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়ামের প্রকৃত রূপকার আমেরিকা। ওরা অবশ্য প্রক্ষেপক যন্ত্র আবিষ্কার করেনি। তবে বিদ্যুৎকে কাজে লাগিয়ে ১৫-ফুট ব্যাসের একটি গোলকের মধ্যে আকাশের জ্যোতিষ্কদের প্রকৃত অবস্থান ফুটিয়ে তুলেছিলেন। উক্ত গোলকে জ্যোতিষ্কদের প্রতিকৃতি অনুযায়ী ছিদ্র রচনা করা হয়েছিল। গোলকের ভেতরটা থাকতো অন্ধকার আর বাহিরে ব্যবস্থা ছিল বৈদ্যুতিক আলোর। তাই ভেতরে বসে উপরের দিকে তাকালে আকাশের তারা মণ্ডলগুলি ফুটে উঠতো। অনুরূপ ব্যবস্থায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিখ শহরেও স্থাপিত হয়েছিল আর একটি আকাশঘর এবং এটি আমেরিকার আকাশঘর অপেক্ষাও নিখুঁত ছিল। তবে এখানেও কোন প্রক্ষেপক যন্ত্র ছিল না।

বর্তমানে আমরা যে প্ল্যানেটেরিয়াম দেখতে অভ্যস্ত তার পরি-কল্পনার মুলে আছে হাইডেনবার্গের রাডেন মানমন্দিরের অধ্যক্ষ "ম্যাক্সজেলফের" অবদান। তবে তিনি পরিকল্পনা খাড়া করেছিলেন

বটে, কিন্তু বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন নি। তাঁর পরিকল্পনাকে যথার্থভাবে রূপ দিয়েছেন বাউয়ের্স ফোল্ড। দীর্ঘ শ্রম এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে তিনি তৈরি করেছিলন মিউনিখ শহরে একটি সর্বাধুনিক প্ল্যানেটেরিয়াম।

উক্ত ঘটনার কিছুকাল পরেই আবিষ্কৃত হয়েছে প্রক্ষেপক যন্ত্র। প্রক্ষেপক যন্ত্র সম্বলিত বাউয়ের্স ফোল্ডের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্ল্যানেটেরিয়াম তৈরি হয়েছিল ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে। তারপর লণ্ডনের দেখাদেখি অপরাপর দেশও তৈরি করতে শুরু করে। কলিকাতায় বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামটি তৈরি হয়েছে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে। পৃথিবীর মোট ষাটটি উন্নত প্ল্যানেটেরিয়ামের মধ্যে বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম অন্যতম। এর গম্বুজের ব্যাস ২৩ মিটার আর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্ল্যানেটেরিয়ামটির ব্যাস ১৫ মিটার এবং এটি মস্কোতে অবস্থিত।

প্ল্যানেটেরিয়াম বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার সমন্বয়ে একটি অভিনব সৃষ্টি।

আগুন

মানবসভ্যতার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার আগুনকেই বলতে হবে। কারণ অগ্নিদেবতাকে বন্দী করার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্পূর্ণভাবে ওলোটপালট হয়ে গেছে এবং এই আগুনই মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে পশুদের কাছ থেকে। এর ফলে জীবনে নিরাপত্তা এসেছে, কাঁচা মাংস খাওয়া রুদ্ধ হয়েছে, আর মানবসভ্যতা একেবারে লাফিয়ে লাফিয়ে যেন এগিয়ে গেছে।

কিন্তু আগুনকে মানুষ কবে যে বন্দী করেছে—সে কথা কেউ ভালভাবে বলতে পারেন না। আর বলতে পারেন না কেমন করে আগুনকে আবিষ্কার করেছে।

সম্ভবতঃ পুরাতন প্রস্তরযুগে গুহাবাসকালে মানুষ আগুনকে কাজে লাগাতে শিখেছিল। তবে কেমন করে যে লাভ করেছিল সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত।

একদল গবেষকের মতে মানুষ অস্ত্রশস্ত্র তৈরির সময় পাথরে পাথর ঘষতে গিয়ে লাভ করেছিল আগুনের ফুলকি। গুহার ভেতরে শুকনো পাতায় ফুলঝুরির মত আগুনের ফুলকি ঝড়ে পড়ে অগ্নিকাণ্ডও হয়তো ঘটতো। সেই থেকে ওর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং বন্দীও করে।

অপরদিকে আর একদল গবেষকের মতে বজ্রপাতের ফলে গাছে আগুন লাগতে দেখে তারা আগুনের প্রচণ্ড দাহিকাশক্তির কথা টের পেয়েছিল। টের পেয়েছিল, আগুন যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর বাহন এবং অল্প আগুনের উত্তাপ শীতের দিনে আরাম আনায়। তাই বুদ্ধি করে ওরা বজ্রপাতের আগুনকে সংগ্রহ করেছিল এবং সেই আগুনের সাহায্যে বন্য-পশুকে বিতাড়িত করেছিল এবং প্রবল শীতে গুহাকে গরম রেখেছিল।

আগুনের সাহায্যে পশুমাংসকে পোড়ানো, রান্না করা, ধাতুনিষ্কাশন ইত্যাদি অনেক পরের ঘটনা।

পার্চমেণ্ট কাগজ

অনেক—অনেকদিন আগেকার কথা, সেই মিশরের নগর সভ্যতার যুগের কথা—সেই আলেকজান্দ্রিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার গৌরবময় যুগের কথা।

কথিত আছে, আলেকজান্দ্রিয়ার টলেমি রাজবংশ ছিলেন ভয়ানক বিদ্যোৎসাহী। এঁদের মধ্যে আবার সর্বাধিক উৎসাহী ছিলেন রাজা পঞ্চম টলেমি। তিনি জগতের জ্ঞানভাণ্ডারকে একত্রিত করতে রাজধানীর বুকে স্থাপন করেন এক বিরাট গ্রন্থাগার। তাতে স্থানলাভ করে প্রায় সাত লক্ষের মত বই। সেকালে এতবড় পাঠাগার পৃথিবীর অপর কোথাও ছিল না।

সে সময় পারগামাম নামে মিশরের প্রতিবেশী আর একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। সেখানকার রাজা ছিলেন এক তরুণ—নাম ইউমেনিস। ভাবলেন ইউমেনিস, পঞ্চম টলেমির মত তিনিও পারগামামে একটি বড় ধরনের গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। রাজ্যের পণ্ডিতদের সামনে মনোভাব ব্যক্ত করতেই পণ্ডিতেরা একবাক্যে সমর্থন করলেন রাজাকে এবং পুঁথি নকল করার সমূহ দায়িত্বও গ্রহণ করলেন।

পুঁথি নকল করার জন্য প্রয়োজন প্রচুর কাগজের। কিন্তু কাগজ-তো ছিল না সেকালে। যা কিছু লেখা হতো, সবই প্যাপিরাসে। সে প্যাপিরাস আবার পাওয়া যেতো কেবলমাত্র মিশরে। যখন পারগামাম মিশর থেকে প্রচুর প্যাপিরাস কিনতে শুরু করলো, তখন টলেমি খোঁজ নিলেন—পারগামাম এত প্যাপিরাস কী করবে? যখনই বুঝতে পারলেন, ইউমেনিস তাঁর উপর টেক্কা দিয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন করতে চাইছেন তখনই পারগামামে প্যাপিরাস রপ্তানি সম্পূর্ণ-রূপে নিষিদ্ধ করেছিলেন। এতবড় সাহস! দিক্‌পাল সম্রাট পঞ্চম টলেমির গৌরবকে ম্লান করে দিতে চায় ছোট্ট একটা রাজ্যের ছোট্ট এক রাজা!

মাথায় হাত দিয়ে বসলেন পারগামামের রাজা ইউমেনিস। তাহলে কী গ্রন্থাগার স্থাপন করা যাবে না? পুনরায় মিলিত হলেন পণ্ডিতদের সঙ্গে। অনুরোধ রাখলেন, যেমন করে হোক প্যাপিরাসের চেয়েও টেঁকসই একটা লেখার মাধ্যমে আবিষ্কার করতেই হবে। তা না হলে সম্মান আর থাকে না। শুধু রাজার নয়, দেশেরও অপমান।

খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। কী হতে পারে প্যাপিরাসের বিকল্প।

শুরু হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চিন্তাভাবনা। শেষে পণ্ডিতেরা বুঝতে পালেন প্যাপিরাসের পরিবর্তে পশুর চামড়াকে ব্যবহার করতে পারলে অনেক বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে। কিন্তু মোটা মোটা পশুর চামড়াকে কাজে লাগানো যাবে কেমন করে?

শেষে ঐ পণ্ডিতেরাই উপায় উদ্ভাবন করলেন। চামড়াকে ভাল করে ধুয়ে এবং তার উপর চুণের প্রলেপ দিয়ে শুকনো হলো রোদে। চেঁছে লোমগুলো তুলে ফেলে ঝামা দিয়ে খুব ভাল করে ঘষা হলো। পাতলা হতে হতে যখন একেবারে প্যাপিরাসের মত পাতলা হয়ে গেল, তখন তার উপর খড়িমাটির প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে দেওয়া হলো রোদে।

এবার আর লেখার কোন অসুবিধা হলো না। সহস্র পশুর চামড়া সংগ্রহ করে লেখার কাজ হলো শুরু। এবং সেই প্রথম চামড়ার তৈরি কাগজ তথা পার্চমেন্ট কাগজের হলো প্রচলন।

ঝড়ের ধকল বড় গাছকে যতটা সহিতে হয়, ছোট গাছকে ততটা নয়। ভূপতিত হতে হয় বড় গাছকেই। ইতিহাসও তার ব্যতিক্রম নয়। রোমসম্রাট জুলিয়াস সিজারের আক্রমণে একরকম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারটি, কিন্তু ছোট্ট রাজ্য পারগমামের গ্রন্থাগারটি অভিযানকারীদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে টিকে ছিল বহু দিন। এখনও সেই কাগজ এবং পুঁথির নমুনা পাওয়া যায় প্রচুর।
